বিবেকানন্দ চরিত



অধ্যাপক

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন কাব্যতীর্থ,

এম্-এ, পি-আর্-এস্

দ্বিতীয় সংস্করণ

১৩৩৮

মূল্য ।/০ পাঁচ আনা মাত্র

প্রকাশক

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন

পি ৪৯, ফার্ণ রোড, বালীগঞ্জ

কলিকাতা।

নিলফামারী

মাধবী-প্রেস হইতে

শ্রীহরিপদ সরকার কর্ত্তৃক মুদ্রি

ভূমিকা

আজকাল মফস্বল হইতে কলিকাতায় কেহ প্রথম আসিলে অন্যান্য দ্রষ্টব্য স্থানের সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ী ও বেলুড় মঠের কথাও বলিতে হয়। এই দুইটি স্থান যে দেখে নাই, তাহার বুঝি কলিকাতা দেখা কিছু বাকী থাকিয়া গেল। স্বামীজির নাম যে বেশী শুনে নাই, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথা যে অতি অল্পই জানে, সে ও দক্ষিণেশ্বর ও বেলুড় দেখিতে ব্যস্ত। বিশেষ, যাঁহারা বেলুড়ে কখনও উৎসবের সময় গিয়াছেন তাঁহারা জানেন বেলুড়ে উৎসবে উপস্থিত লোকসংখ্যা কেমন দিন দিন বাড়িয়াই চলিতেছে। দেশের লোকের উপর বেলুড়ের প্রভাব বড় সামান্য নয়। হিন্দুর পঞ্জিকায় দুর্গোৎসব, শ্যামা পূজা ইত্যাদির ন্যায় বেলুড়ের মহোৎসবও স্থান পাইয়াছে, ইহা সাম্প্রদায়িক গণ্ডী ছাড়িয়া হিন্দুর জাতীয় উৎসবের মধ্যে স্থান পাইয়াছে।

আবার শুধু উৎসবে নয়, ব্যসনে এবং দুর্ভিক্ষেও বেলুড় আমাদের বন্ধু। দেশে কোনও স্থানে দুর্ভিক্ষ, মহামারী, ভূমিকম্প, বন্যা, অগ্নিকাণ্ড প্রভৃতি উপস্থিত হইলে আমরা রামকৃষ্ণ মিশনের কথাই প্রথমে জিজ্ঞাসা করি, জানিতে চাই উহারা কি করিতেছে; বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য উহাদের মুখের দিকে তাকাইয়া থাকি।

বেলুড় আজও সজীব আছে; প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে ইহাতে যে আগুন জ্বলিয়াছিল তাহা নিভে নাই—নিভিবার লক্ষণও নাই। আজও বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত বাঙ্গালী যুবক গৃহত্যাগী হইয়া বেলুড়ে আসিয়া ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিতেছেন। প্রায় ত্রিশ

বৎসর হইল এই আত্মত্যাগের আদর্শ-স্বরূপ সন্ন্যাসী সঙ্ঘ গঠিত হইয়াছে, ইহারই মধ্যে সঙ্ঘের প্রভাব দেশে বিদেশে ছড়াইয়া পড়িতেছে। যাঁহার উৎসাহে ইহার প্রতিষ্ঠা, সেই স্বামী বিবেকানন্দের কথা আমরা এখানে আলোচনা করিতে চাই। কেমন অবস্থায় তাঁহার জন্ম, কিরূপ শিক্ষা তিনি পাইয়াছিলেন, কেমন করিয়া মহাপুরুষ-সংস্পর্শে আসিলেন, তাঁহার সন্ন্যাস ও ভারত-পর্য্যটন, তাঁহার দিগ্বিজয়, দেশে ফিরিয়া তাঁহার বিবিধ কর্ম্মানুষ্ঠান, আমাদের সামান্য বুদ্ধি লইয়া এ সব কথা আমরা বুঝিতে চাই। রচিত পুস্তক বা জীবনী পড়িয়া কোন লোকেরই সম্পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায় না, মহাপুরুষদের ত কথাই নাই; তবু যতটা জানিতে পারি তাহাই লাভ।

আমাদের জাতীয় ইতিহাসে বিগত ঊনবিংশ শতাব্দী স্মরণীয় কাল; অনেক নূতন ধারার আরম্ভ এইখানে। বেশী দিন চলিয়া যায় নাই বলিয়াই হয়ত এইরূপ মনে হইতেছে, কে জানে। কিন্তু ধর্ম্মই বল, সাহিত্যই বল, আর রাজনীতিই বল, গত ৬০।৭০ বৎসরের মধ্যে সমস্ত বিষয়ে দেশে একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। বৈদিক ধর্ম্ম প্রচারের জন্য একদিকে আর্য্য সমাজ সচেষ্ট, অন্যদিকে ব্রাহ্মসমাজ উপনিষদের অধ্যাত্মজ্ঞান সমাজে সঞ্চারিত করিতে যত্নবান। সনাতন হিন্দুধর্ম্ম রক্ষার জন্য কেহ উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন; বিদেশ হইতে থিওজফিষ্টরা আসিলেন; ইংরাজীনবীশ মহলে গীতার প্রাধান্য মানা হইল। বঙ্কিমচন্দ্র, পরিব্রাজক কৃষ্ণানন্দ, পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি—ইঁহারা গীতার নানারূপ ব্যাখ্যা প্রচার করিতে লাগিলেন। বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যের জন্মও এই উন-

বিংশ শতাব্দীতে। ইংরাজী প্রভাবে আসিয়া তার পর জনসাধারণের উপযোগী হইতে হইবে বলিয়া সাহিত্য একেবারে নূতন ছাঁচে গড়িয়া উঠিল। রামমোহন, বিদ্যাসাগর প্রভৃতি সুধীবর্গ নূতন রীতি চালাইয়া দিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র তাহার পুষ্টিসাধন করিলেন। অন্যান্য প্রদেশেও প্রাদেশিক ভাষাগুলি নূতন জীবন পাইল। আর রাজনীতির কথা,—সারাদেশব্যাপী আন্দোলনের সূত্রপাত হইল, ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে নিখিল ভারত জাতীয় মহাসভার প্রতিষ্ঠায়।

এইরূপে নানাদিক হইতে দেখিতে পাই, বঙ্গের সুপ্তি যেন ধীরে ধীরে ভাঙ্গিতেছিল। এমন সময় গঙ্গাতীরে কঠোর সাধনায় রত এক নিরক্ষর ব্রাহ্মণ নানাদিক হইতে নানাভাবের তপস্যায় নিজকে উপলব্ধি করিতেছিলেন। শুধু কয়জন অল্পবয়স্ক বালক ও যুবকের যত্নে সেই অপূর্ব্ব সাধনার ফল আজ দেশবিদেশে প্রচারিত হইয়াছে; স্বামী বিবেকানন্দ এই নূতন ভাবের দ্বারা জগৎ জয় করিলেন।

আমরা চাই, স্বামীজির চরিত কীর্ত্তন। বিবেকানন্দ মহাপুরুষ ছিলেন; আমরা চাই,—এই মহাপুরুষের জীবনী আলোচনা করিয়া শিখিতে, ইঁহার নিকটে কি পাইয়াছি তাহা বুঝিতে, ইঁহার বাণী কি তাহা জানিতে। আসুন পাঠক, শ্রদ্ধা লইয়া বর্ত্তমান প্রসঙ্গের আরম্ভ করা যাক।

১৩২৭।

দ্বিতীয় সংস্করণে নিবেদন

দশ বৎসর পূর্ব্বে বিবেকানন্দ চরিত প্রকাশিত হয়। এতদিন পরে আবার উহা প্রকাশের প্রয়োজন হইয়াছে। দ্বিতীয় সংস্করণে যথাসম্ভব অল্পবিস্তর পরিবর্ত্তন করা গেল এবং পরমহংস দেবের ও স্বামীজির এক একখানি চিত্রও দেওয়া হইল। এখন ইহা সাধারণ পাঠকের উপকারে লাগিলে কৃতার্থ বোধ করিব।

অগ্রহায়ণ, ১৩৩৮ শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন

জন্ম ও শিক্ষা

স্বামী বিবেকানন্দের পূর্বনাম—নরেন্দ্রনাথ। নরেনের পিতৃকুলের পরিচয় দিতে গেলে প্রথমেই মনে পড়ে তাঁহার পিতামহ দুর্গাচরণের কথা। কলিকাতার সিমুলিয়ার বিখ্যাত দত্তবংশে দুর্গাচরণের জন্ম, এবং মাত্র ২৫ বৎসর বয়সেই তিনি সন্ন্যাসী হন। তাঁহার কথা এখানে বলার এই প্রয়োজন যে, দুইজনের চেহারা দেখিতে অনেকটা একরকম ছিল এবং দুইজনেই প্রায় একবয়সে সন্ন্যাসী হন। পিতামহের আদর্শ নরেন্দ্রনাথ যেন বংশগত অধিকার বলিয়া পাইয়াছিলেন।

দুর্গাচরণের পুত্র বিশ্বনাথ। ইনি তেজস্বী, উদার ও দানশীল ছিলেন; যদিও ইনি আইন ব্যবসায়ে (এটর্ণিরূপে) অনেক টাকা পাইতেন তবু ইঁহার বংশধরদিগকে সামান্য উদরান্নের জন্য কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। বিশ্বনাথের তিন পুত্র—নরেন্দ্র, মহেন্দ্র, ভূপেন্দ্র। নরেন্দ্র সকলের বড় এবং জন্ম সন ১২৬৯ সালের ২০শে পৌষ তারিখে।

নবজাত শিশুর নাম কি রাখা যাইবে, তাহা লইয়া প্রথমে কিছু গোল বাধিল। শেষে, মাতার নির্দ্দেশানুসারে নাম দেওয়া গেল বীরেশ্বর, কিন্তু অতবড় নাম উচ্চারণ-মাহাত্ম্যে 'বিলে'তে গিয়া দাঁড়াইল। তখন 'নরেন্দ্র' এই নাম দেওয়া হয়। এই নাম স্বামীজির পক্ষে সার্থক হইয়াছিল। কাণাছেলের নামও

পদ্মলোচন হয়, কিন্তু নরেন্দ্রনাথ নিজের তেজোগুণে বাস্তবিকই মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন পাইয়াছিলেন।

নরেন ছেলেবেলায় অতিশয় দুরন্ত ছিলেন। মাতা ভুবনেশ্বরী তাঁহার জন্য দুই দুইজন ঝী রাখিয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাদের পক্ষে তাঁহাকে সাম্‌লান দায় হইত। সাধু সন্ন্যাসী দেখিলেই তিনি হাতের কাছে যাহা পাইতেন তাহা দিয়া ফেলিতেন। ছেলেবেলায় একবার চোর চোর খেলিতে গিয়া সিঁড়ি হইতে পড়িয়া মাথায় বিশেষ চোট্ পান। রামকৃষ্ণ দেব বলিতেন—ওর ওই ঘা না পেলে আপনার তেজে আপনি জলে যেত। নরেন স্কুলে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারিতেন না বেঞ্চে ঠিক বসাও নয় দাঁড়ানও নয় এমনি এক ভাবে থাকিতেন। আবার এই অস্থির ভাবের সঙ্গে মিশিয়াছিল অসাধারণ স্থির ভাব। যিনি এমনি ধারা দুরন্ত ছিলেন তিনিই অতি শৈশবেই আবার এমন ভাবে স্থির হইয়া বসিতে পারিতেন যে বাহিরের কোনজ্ঞান থাকিত না। একবার ধ্যান ধ্যান খেলিতে বসিয়াছেন, সঙ্গীরা সকলে চোখ বন্ধ করিয়া ধ্যানের ভাণ করিতেছে, তাহাদের মধ্যে তিনিও আছেন, এমন সময়ে হঠাৎ এক বিষধর সাপ ছেলেদের চোখে পড়িল,—আর তখনি সকলে ধ্যান ছাড়িয়া সটান্ ছুট্— একেবারে অভিভাবকদের কাছে হাজির। নরেনের বাড়ীর লোকেরা আসিয়া দেখিলেন, নরেন স্থির হইয়া চক্ষু মুদিয়া বসিয়া আছে, আর সাপটী তাহার কাছ দিয়া আস্তে আস্তে চলিয়া গেল।

এই স্থির-অস্থির ভাবের সঙ্গে আবার অনেক সাহসের পরিচয়ও পাওয়া গিয়াছিল। তাহার মধ্যে কয়েকটি খুব কৌতুক-

জনক। একবার তিনি ও অন্যান্য ছেলেরা নৌকা করিয়া গঙ্গায় বেড়াইতে গিয়াছিলেন, এমন সময় একটি ছেলের অসুখ হওয়ায় সে নৌকাতেই বমি করে। তাহাতে মাঝিরা ভয়ানক রাগিয়া যায় এবং ছেলেদিগকে গালাগালি দেয়। গঙ্গার ধারে নৌকা ফিরিয়া আসিলে এ বিষয় লইয়া ছেলেদের সহিত তাহাদের বচসা হয়; ছেলেরা বমি পরিষ্কারের জন্য ডবল নৌকা ভাড়া দিতে চায়, কিন্তু মাঝিরা চায় ছেলেরা নিজেই উহা পরিষ্কার করিয়া ফেলুক, নতুবা তাহাদিগকে নৌকা হইতে নামিতে দেওয়া হইবে না। বিষম সঙ্কট, এমন সময় নরেন তীরে দুইজন গোরা টলিতে টলিতে আসিতেছে দেখিতে পাইল, দেখিয়াই সে অতর্কিতে নৌকা হইতে লাফাইয়া পড়িয়া, কেহ নজর করিবার পূর্ব্বেই ছুটিয়া সাহেব দুজনার কাছে ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরাজীতে ব্যাপার বুঝাইল। সাহেবেরা ব্যাপার বুঝিয়া তাড়াতাড়ি আসিয়া গম্ভীরস্বরে হাঁকিলেন—নৌকা ভিড়াও, অমনি মাঝিরা নিরীহ মেষ শাবকের মত থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে নৌকা ঘাটে লাগাইল, নরেনের সঙ্গীরাও প্রাণে বাঁচিল।

আর একবার এক থিয়েটার হলে এক কাণ্ড হয়। একজন অভিনেতার নামে ওয়ারিণ্ লইয়া বেলিফ্ তাহাকে ধরিতে আসিয়াছে, অভিনয় কিন্তু আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। বেলিফ্ মঞ্চের উপর আসিয়া গ্রেপ্তার করিবে এমন সময়ে কে একজন চীৎকার করিয়া উঠিল, "কে তুমি সরে দাঁড়াও—এখনি সরে দাঁড়াও।" সে চীৎকার নরেনের। তাঁহার কথা শুনিয়া অন্য সকলে অমনি তাহার প্রতিধ্বনি করিয়া উঠিল। মহা সোরগোল

উপস্থিত। অগত্যা বেলিক্ বেচারীকে অভিনয় শেষ হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইল সকলে নরেনের প্রশংসা করিয়া বলিল, বেশ ছোক্‌রা, তুমি না হলে আমাদের থিয়েটার দেখার টিকিট মাঠে মারা গিয়েছিল আর কি।

খেলায় তিনি সর্দ্দার ছিলেন। পুরুষের যাহা জানা উচিত তাহা তাঁহার জানা ছিল—কুস্তী, ঘুসিখেলা বা বক্সিং, লাঠি ইত্যাদি। লাঠিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তাঁহার বয়স যখন দশ বৎসর তখন একদিন মেলা দেখিতে যান। কিছুক্ষণ পরে লাঠিখেলা আরম্ভ হইল—খেলায় যখন ভাঁটা পড়িয়াছে, কিছুতেই যখন জমিতেছে না, তখন নরেন অগ্রসর হইয়া উপস্থিত যে কাহাকেও তাঁহার সহিত খেলিতে ডাকিলেন। কেহই তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইতে পারিল না। একজন আসিল, তাহার বয়স তাঁর চাইতে অনেক বেশী, গায়েও বেশ জোর আছে, কিন্তু তিনি তাহার লাঠিখানি দুই টুক্‌রা করিয়া ফেলিলেন! ছেলেবেলায় তিনি দুইবার পুরস্কার পাইয়া ভারী খুসী হন—যেবার এণ্ট্রান্স পাস করেন, সেবার তাঁহার বাবা তাঁহাকে একটি ঘড়ি দেন, আর একবার বক্সিং খেলায় রূপার ছোট্ট একটি সুন্দর প্রজাপতি পান। এইরূপ ব্যায়ামের জন্য তাঁহার শরীর সুন্দর ও দৃঢ়ভাবে গড়িয়া উঠে। এইজন্য তিনি ছেলেদের সর্দ্দার হইতে পারিতেনও বেশ। তাঁহার চেহারা পুরুষোচিত বলিষ্ঠ ও সুন্দর ছিল; প্রতি বেশে, প্রতি ভাবে, একটা সহজ সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠিত।

কিন্তু এই বালকের শুধু যে শরীর সুন্দর ছিল তাহা নয়, মনটাও ভারী চমৎকাররূপে গড়িতেছিল। সঙ্গীদের মধ্যে কাহারও কিছু বিপদ দেখিলে বা বাহিরে কোথাও কাহারও সাহায্যের প্রয়োজন হইলে, নরেন তখনই তাহার সাহায্যের জন্য প্রস্তুত। একবার তাঁরা কয়জন পায়ে হাঁটিয়া বেড়াইতে যাইতেছিলেন, এমন সময় একজন ছেলের শরীর অসুখ হইল, সে বলিল আমি আর চলিতে পারিতেছি না, তোমরা যাও, আমি পরে আস্তে আস্তে যাইব। নরেন ছেলেদিগকে লইয়া কিছুদূর গিয়া একা ফিরিলেন এবং সেই ছেলেটির কাছে গিয়া দেখিলেন তাহার খুব জ্বর হইয়াছে; তখন তিনি তাহাকে গাড়ী করিয়া তাহার বাসায় পৌছিয়া দিলেন। আর একবার তিনি ও তাঁহার সঙ্গী—দুজনেই খুব ছোট—মেলায় পুতুল কিনিয়া বাড়ী ফিরিতেছিলেন। লোকের ভিড়ে দুইজনে ছাড়াছাড়ি হইল; কিছুক্ষণ পরে নরেন পিছনে ফিরিয়া দেখিলেন, একটা গাড়ী ছুটিয়া আসিতেছে, তাঁহার সঙ্গীর উপরে আসিয়া পড়ে আর কি। তৎক্ষণাৎ তিনি পুতুল ফেলিয়া সঙ্গীটিকে প্রায় ঘোড়ার পায়ের কাছ থেকে সরাইয়া আনিলেন।

বালক নরেনের আর দুই একটা ক্ষমতার কথা বলি। পরজীবনে তাঁহার সঙ্গীতজ্ঞান ও বক্তৃতা শক্তির কথা শুনিয়া আমরা আশ্চর্য্য হই, কিন্তু ঐগুলিরও এই সময়েই স্ফুরণ হইয়াছিল। সঙ্গীতে তিনি অসাধারণ নৈপুণ্য লাভ করেন; তাঁহার ওস্তাদ যিনি, তিনিও শেষে তাঁহার সহিত পারিতেন না; তাঁহার কণ্ঠ

স্বভাবতই মধুর ছিল। আর বক্তৃতার কথা—একদিন মাননীয় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মেট্রোপলিটান্ স্কুলে কোনও সভার সভাপতি হইয়া আসেন। জনৈক শিক্ষক স্কুল ছাড়িয়া চলিয়া যাইবেন, তাঁহাকে বিদায় দিতে হইবে, তাই সভা বসিয়াছিল। সুরেন্দ্রবাবু বাগ্মিশ্রেষ্ঠ, তাঁহার সম্মুখে ছাত্রদের পক্ষ হইতে কে দাঁড়াইয়া দুই কথা বলিবে? কাহারও সাহস হইল না। অবশেষে নরেনের উপর ভার পড়িল, নরেন তখনি রাজী হইলেন, এবং ছাত্রদিগের মনোভাব প্রায় আধঘণ্টা ধরিয়া বক্তৃতা করিয়া বুঝাইয়া দিলেন; এই বক্তৃতা শুনিয়া সুরেনবাবুও যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছিলেন।

১৪ বৎসর বয়সে কলিকাতা ছাড়িয়া নরেন রায়পুর যান। বিশ্বনাথ মাঝে মাঝে কলিকাতা ছাড়িয়া অন্যত্র গিয়া কিছুদিন কাটাইয়া আসিতেন, এবার নরেনও তাঁহার সঙ্গ ধরিলেন। বিশ্বনাথের শিক্ষাদানের রীতি কিছু স্বতন্ত্র ছিল। একবার নরেন রাগিয়া মাকে গালাগালি দেন, দিয়া তিনি বন্ধুদের বাড়ী বেড়াইতে যান। বন্ধুদের সঙ্গে ঘরে ফিরিয়া দেখেন, নিজের পড়িবার ঘরে বড় বড় অক্ষরে লেখা আছে, আজ নরেনবাবু তাঁহার মাকে এই এই বলিয়া গালাগালি দিয়াছেন। নরেন তখনি লজ্জিত হইয়া মায়ের নিকট ক্ষমা চাহেন। যাহা হউক, এবার রায়পুরে প্রায় দুইবৎসর থাকা হইল। এ সময়ের মধ্যে আর স্কুলে পড়া হইল না, লাভ হইল শুধু ম্যালেরিয়া রোগ অর্জ্জন আর প্রকৃতি দেবীর সৌন্দর্য্যবৈচিত্র্য উপভোগ। এখানে

অনেক শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত, বিশ্বনাথের সঙ্গে শাস্ত্রীয় আলাপ করিতে আসিতেন। কখনও বা পণ্ডিত সমাজে তর্ক লাগিত, নরেন সব মন দিয়া শুনিতেন, সুবিধা মত দুই এক কথা বলিতেনও।

রায়পুর হইতে ফিরিয়া আসিয়াই তাঁহাকে মেট্রোপলিটান্ স্কুল হইতে এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দিতে হইল। কয়েকমাস খুব পরিশ্রম করিয়া পরীক্ষা দিলেন এবং স্কুলের ছেলেদের মধ্যে শুধু তিনিই প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া স্কুলের নাম রাখেন। ইহার পর তাঁহার কলেজ জীবনের আরম্ভ।

কিন্তু এই সময়ে তাঁহার শরীর অসুস্থ হইয়া পড়িল, তাহা ছাড়া রায়পুর থাকিতে তাঁহাকে ম্যালেরিয়া ধরিয়াছিল। একজন্য তাঁহাকে এক বৎসর পড়া বন্ধ করিতে হয়। পরবৎসর জেনেরেল্ এসেম্ব্লীতে ভর্ত্তি হইলেন। এই সময় হইতে গতানুগতিক ভাবে না চলিয়া তিনি নিজের পাঠের স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করিলেন। পাশ্চাত্য দর্শন শাস্ত্রের উপর তাঁহার নজর ছিল বেশী; এখন হইতে পড়ার দিকে তাঁহার খুব ঝোঁক দেখা গেল। জীবনের উদ্দেশ্য কি, আমরা কি করিতে আসিয়াছি, মানুষের ইচ্ছাশক্তির স্বাধীনতা আছে কিনা,—এই সব বিষয় লইয়া নানা সমস্যা তাঁহার মনে জাগিয়া উঠিত। শুধু বই পড়িয়া তাঁহার মনে তৃপ্তি হইল না; কোম্‌ত্, সোপেন্‌হয়ার, স্পেন্‌সার প্রভৃতির লেখা তিনি পড়িতেন এবং ইঁহাদের মত আলোচনা করিয়া ও স্পেন্সারের মত কিয়ৎ পরিমাণে খণ্ডন করিয়া স্পেন্‌সারের নিকট এক পত্র লিখেন; স্পেন্‌সার এই পত্র পাইয়া ভারী খুসী হইয়া উত্তর দেন, তাহাতে বলেন, পরবর্ত্তী সংস্করণে

তাঁহার নিজ গ্রন্থের কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করিবেন। ব্যাপার অবশ্য সামান্য, কিন্তু ইহা হইতে বুঝা যায় তিনি দার্শনিক সমস্যার উত্তর দিতে, কি করিতে আসিয়াছি ও আমাদের শক্তি কত ইত্যাদি বিষয় জানিতে কতদূর ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। অবশেষে, এবং সহাধ্যায়ী ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়ের সাহায্যে, তাঁহার এই ধারণা জন্মিল, জ্ঞানশক্তি এই সমস্ত জগৎ চালাইতেছে। ইহাতেও তিনি খুসী হইতে পারিলেন না। সাকার মূর্তিমান্ ভগবানের সাক্ষাৎ লাভ করিবার জন্য তিনি প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এই সময়ে তিনি ব্রাহ্ম সমাজের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন; ব্রাহ্মসমাজের তখন উন্নত অবস্থা; নূতন উৎসাহে ও নূতন তেজে আচার্য্যগণ প্রচার কার্য্য চালাইতেছেন। তখন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ও ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের যুগ, পবিত্রতার দিকে খুব দৃষ্টি, নরেনের মনও এই সময় গম্ভীর ও পবিত্রভাবে পূর্ণ; ব্রাহ্ম সমাজের সংশ্রবে আসিয়া মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত তাঁহার পরিচয় হইল। একদিন নরেনের প্রাণ ভগবানের সাক্ষাৎ পাইবার জন্য এতই ব্যগ্র হইয়া উঠিল যে তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, মহর্ষি যে বোটের উপর বসিয়া ধ্যান করিতেন একেবারে সেখানে গিয়া উপস্থিত। সেখানে গিয়া ধ্যানমগ্ন মহর্ষিকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—মহাশয়, আপনি কি ভগবান্‌কে দেখিয়াছেন? ধ্যানভঙ্গে মহর্ষি ঐ প্রশ্ন সহসা দুইবার শুনিয়া কোনও উত্তর দিতে পারিলেন না, নরেনের মুখ হইতে যখন ঐ প্রশ্ন তিনবারের বার বাহির হইল, তখন তিনি বলিলেন,—বৎস তোমার চোখইত যোগীর মত।

অর্থাৎ যেরূপ চোখ থাকিলে যোগী হওয়া যায় বা ভগবানকে দেখার শক্তি জন্মে, তোমার চোখ সেইরূপ, এবং তাহার মধ্য দিয়াই আমি ভগবানকে দেখিতেছি।

নরেন এই উত্তরে সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না; আরও অনেকের কাছে গেলেন, অনেক সাধু সন্ন্যাসীকে প্রশ্ন করিলেন, কেহই তাঁহাকে সদুত্তর দিতে পারিল না। এমন সময় তাঁহার আত্মীয় রামচন্দ্র তাঁহাকে বলিলেন, "বিলে, তুই এত লোকের পেছনে ঘুর্‌ছিস্‌, একবার দক্ষিণেশ্বর যা, তুই যা চাস্‌ তা পাবি।

মহাপুরুষের আশ্রয়

বিধির বিধানে দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে রামকৃষ্ণ পরমহংস-দেবের সহিত নরেনের সাক্ষাৎ হইল। নরেন অন্যান্য সাধুর মত তাঁহাকেও জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়, আপনি ঈশ্বর দেখিয়াছেন কি?" ইহার উত্তর যাহা পাইলেন, তাহাতে তাঁহাকে আশ্চর্য্য হইতে হইল। —"হাঁ, দেখেছি। তোকে যেমন আমি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি ঠিক এমনি তাঁকে আমি দেখ্‌তে পাই। শুধু তাই নয়, আমি তোকেও ঈশ্বর দেখাতে পারি।"

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সহিত নরেন্দ্রের এই সাক্ষাৎ, তাঁহার বি,এ পরীক্ষার কয়েকদিন আগে ঘটে। নরেন্দ্রনাথ সঙ্কল্প করেন, তিনি আর দক্ষিণেশ্বরে আপনা হইতে যাইবেন না। আশ্চর্য্যের বিষয়, ইহার পরে রামকৃষ্ণ নিজে ২।৩ বার নরেনকে দেখিতে আসিলেন, কাজেই নরেনকে অগত্যা দক্ষিণেশ্বরে যাইতে হইল। প্রথম প্রথম তিনি বলিতেন, "তোমার কথা শুনতে আসি না, তোমায় দেখ্‌তে আসি," কিন্তু ক্রমেই তাঁহার ভক্ত হইয়া পড়িলেন। এই ভালবাসাই তাঁহাকে বাঁধিয়া রাখিল। প্রথম দেখা হওয়ার পর যখন কিছুদিন আর গেলেন না, তখন এই মহা-সাধক ব্রাহ্মসমাজে গিয়া উপস্থিত, ব্যাকুল কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "নরেন, নরেন, তুই যাস্‌নি কেন?" যিনি আদর্শ কামকাঞ্চন-ত্যাগী তিনিও নরেনের জন্য, তাহার অর্থকষ্ট কিসে দূর হয় সেজন্য, চিন্তিত। নরেন প্রতিক্ষণে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অলৌকিক ভালবাসা



পাইয়াছেন। তিনি একপত্রে লিখিয়াছেন, যে "রামকৃষ্ণের জুড়ি আর নাই, সে অপূর্ব্ব সিদ্ধি, আর সে অপূর্ব্ব অহৈতুকী দয়া, সে (Intense Sympathy) বদ্ধজীবের জন্য গভীর সমবেদনা—এ জগতে আর নাই ...... তাঁহার জীবদ্দশায় তিনি কখনও আমার প্রার্থনা গর মঞ্জুর করেন নাই—আমার লক্ষ অপরাধ ক্ষমা করিয়াছেন—এত ভালবাসা আমার পিতামাতা কখনও বাসেন নাই। ইহা কবিত্ব নহে, অতিরঞ্জিত নহে, ইহা কঠোর সত্য এবং তাঁহার শিষ্যমাত্রই জানে। বিপদে, প্রলোভনে, 'ভগবান্ রক্ষা কর' বলিয়া কাঁদিয়া সারা হইয়াছি—কেহ উত্তর দেয় নাই—কিন্তু এই মহাপুরুষ বা অবতার বা যাই হউন, নিজ অন্তর্যামিত্বগুণে আমার সকল বেদনা জানিয়া নিজে ডাকিয়া জোর করিয়া সকল অপহৃত করিয়াছেন।" পরমহংসদেবের সহিত যখন দেখা হয় তখন নরেনের বয়স প্রায় বিশ বৎসর, তার পর ৪।৫ বৎসর তিনি তাঁহার গুরুদেবের সঙ্গভোগ করিতে পারিয়াছিলেন! এই কয় বৎসরে তিনি একটা প্রেরণা পাইলেন, সে প্রেরণা তাঁহাকে ধর্ম্মের পথে—দেবজন্মের পথে—বহুদূর অগ্রসর করিয়া দিল। আমেরিকায় তিনি "মদীয় আচার্য্যদেব" সম্বন্ধে এক বক্তৃতা দেন, তাহাতে শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখিয়া কোন্ দুইটি জিনিষ তাঁহার সব চাইতে চোখে লাগে তাহা তিনি বলিয়াছিলেন। ঐ প্রথম প্রশ্নটীর উত্তর তাঁহাকে স্তম্ভিত করিয়া দিল—"মহাশয়, আপনি কি ঈশ্বর দেখিয়াছেন?" ধর্ম্ম অনুভূতির জিনিষ, জীবনে তাহা বাস্তব করিতে হইবে, প্রত্যক্ষ করিতে হইবে। পঞ্জিকায় অনেক আড়া জলের কথা লেখা আছে, কিন্তু পঞ্জিকা নিঙ্ড়াইলে এক ফোঁটা

জলও পড়ে না। তেমনি শাস্ত্রের বিধি কর্ম্মে আচরিত না হইলে, শুধু বইয়ে লেখা থাকিলে, তাহাতে কি ফল? "আপনি আচরি ধর্ম অপরে শিখায়।" এই হইল প্রথম কথা। দ্বিতীয় কথা হইতেছে এই—যে ধর্ম্মই মান, ভগবানকে পাইবেই। সব ধর্ম্মেরই গন্তব্য পথ এক, সকল ধর্ম্মই সত্য। তাঁহার গুরুদেব মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া আল্লার ভজনা করিলেন, খ্রীষ্টান্ হইয়া যীশুর উপাসনা করিলেন, আবার নানকের গ্রন্থসাহেবও পূজা করিলেন। এদিকে রাম, কৃষ্ণ, শিব, শক্তি, বেদান্ত—হিন্দুধর্ম্মের সকল পথেই নিজে চলিয়া ধর্ম্ম সাধনা করিয়াছিলেন। সে কঠোর তপস্যার কথা, সে প্রতিপদে ভগবানের সহিত একত্র বাস, সে অদ্ভুত প্রীতি, সে লোকাতীত কামকাঞ্চন-ত্যাগ, সে অহৈতুকী নিষ্ঠার কথা ভাষায় লিখিয়া প্রকাশ করা যায় না। নরেনের মত দার্শনিক, নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসককেও, এই মহাপুরুষ সংস্পর্শে আসিয়া সগুণ ব্রহ্মের মাহাত্ম্য স্বীকার করিতে হইল। তৃতীয়বার যখন নরেন দক্ষিণেশ্বরে আসেন তখন পরমহংসদেব তাঁহাকে স্পর্শ করিয়াছিলেন, তখনি নরেনের বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হইবার উপক্রম হইল, তিনি চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন,—'ওগো, আমাকে কি করলে গো, আমার যে বাপ মা আছে গো!'—এই স্পর্শ তাঁহার সহিত চিরকাল যুক্ত ছিল এবং গুরুদেবের কৃপায় নরেন নির্ব্বিকল্প সমাধিও কিছুক্ষণের জন্য লাভ করিয়াছিলেন।

এদিকে আবার জীবের সাংসারিক দুঃখকষ্টও আছে। বি-এ পরীক্ষা দেওয়ার অল্পকাল পরেই নরেনের পিতৃবিয়োগ হইল,

সংসারের সমস্ত দারিদ্র আসিয়া ঘাড়ে পড়িল। বিশ্বনাথ মুক্তহস্তে দান করিতেন, ছেলেপিলের জন্ম কিছুই রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। দুই চারি দিন দুঃখশোকে চলিল, তাহার পর অন্নচিন্তার আরম্ভ। ধর্ম্ম কর্ম্ম যাহাই হউক, ঘরে মা আছেন, ছোট ছোট ভাই দুইটি আছে, তাহাদের খাবার জোগাইতে হইবে। বিদ্যাসাগর মহাশয় এক স্কুলে চাকরী জোগাড় করিয়া দিলেন, তাহাতে মাস খানেক চলিল; তার পরে যখন যাহা পাইতেন তাহাতেই 'কোনও রকমে' চালাইতেন। এই 'কোনও রকমের' অর্থ আমরা আজও জানিতে পারি নাই। এমন অনেক দিন গিয়াছে, নরেনকে অনাহারে থাকিতে হইয়াছে। ঘরে খাবার অল্প আছে দেখিয়া মাকে বলিয়াছেন, অন্যত্র নিমন্ত্রণ আছে, তার পর হয়ত কোথাও বেড়াইয়া আসিলেন। এই সব ভাবনা একদিকে, অন্যদিকে সন্ন্যাসের প্রবল আকর্ষণ; এক দিকে বি,এ পাশ করিয়া আইন পড়া, অন্যদিকে বেদান্ত—নরেন একদিন উত্তেজিত হইয়া দক্ষিণেশ্বর অভিমুখে ছুটিলেন। পা হইতে চটি খসিয়া পড়িল, কাঁটায় সমস্ত শরীর ক্ষত হইল, তাহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই—সটান্ পরমহংস দেবের কাছে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, মা কালীকে বলিতে হইবে, নরেনের পরিবারের উদরান্ন সংস্থানের জন্য। নরেনের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল,—পরমহংসদেব বলিলে মা কালী অবশ্য শুনিবেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকেই পাঠাইলেন, নরেন গিয়া মন্দিরে দাঁড়াইবামাত্র তাঁহার মনের ভাব বদ্লাইয়া গেল। টাকা কড়ির কথা ভুলিয়া তিনি চাহিলেন, জ্ঞান, ভক্তি, বৈরাগ্য।

ফিরিয়া যখন আচার্য্যের কাছে আসিলেন, তখন তাঁহার হুঁস্ হইল যে তিনি যাহা মনে করিয়া গিয়াছিলেন তাহা ভুলিয়া গিয়াছেন। দ্বিতীয়বার শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে পাঠাইলেন, দ্বিতীয়বারও দেবীমূর্ত্তির কাছে গিয়া জ্ঞান বৈরাগ্যই চাওয়া হইল, টাকা কড়ির কথা মনেই পড়িল না। তৃতীয়বারও এইরূপ ঘটিল। তখন পরমহংসদেব বলিলেন,—যা, মা তোর বাড়ীর মোটা ভাত মোটা কাপড়ের ব্যবস্থা করে দেবেন। সেই সময় হইতে পরিবারের খরচ-পত্র কোনও রকমে চলিয়া যাইতেছে।

নরেনের সন্ন্যাসী হওয়ার সম্ভাবনা ক্রমেই বেশী হইতে লাগিল। বিশ্বনাথ বাঁচিয়া থাকিতে বিবাহের চেষ্টা করিতেছিলেন, তাঁহার ইচ্ছা ছিল নরেন বিলাত গিয়া সিভিল সার্ব্বিস পাশ হইয়া আসুক। কিন্তু বিবাহের কথায় সর্ব্বত্রই একটা না একটা খুঁত রহিয়া গেল। এক জায়গায় কথাবার্ত্তা অনেকটা ঠিক হইয়া আসিয়াছিল কিন্তু এমনি সময় পিতার মৃত্যু হইল, নরেনের বিবাহ আর হইল না।

পরমহংসদেবের শিক্ষার গুণে ক্রমে নরেন্দ্রনাথ সাকার উপাসনার মাহাত্ম্য স্বীকার করিলেন। এতদিন জ্ঞানের দিক দিয়া তাঁহার সাধনা চলিতেছিল, এখন ভক্তির পথে চলা আরম্ভ হইল। এদিকে পরমহংসদেব দুরারোগ্য গলক্ষতে আক্রান্ত, কথা কহিতে চিকিৎসকের নিষেধ, তবু তিনি সে সব না শুনিয়া নবীন শিষ্যদের সঙ্গে নানা বিষয়ে আলোচনা করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে কাশীপুর বাগানে লইয়া যাওয়া হইল, নরেন ও অন্যান্য ভক্তেরা এখানে গুরুর সেবা করিতে লাগিলেন। এই

সময় রামকৃষ্ণদেব কয়েকজন শিষ্যকে যথারীতি সন্ন্যাসধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। একদিন নরেন ও আর চারজনকে গেরুয়া পরিয়া ভিক্ষা করিতে বলিলেন, তাহারা তাঁহার কথামত ভিক্ষা করিয়া নিজেরা রাঁধিয়া তাঁহাকে খাওয়াইল। এই সময় হইতে রামকৃষ্ণদেব শিষ্য-দিগকে কি করিয়া জীবন কাটাইতে হইবে সেই সব বিষয়ে নানাবিধ উপদেশ দিতেন। ক্রমে দিন ফুরাইয়া আসিল; ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই আগষ্ট তাঁহার তিরোধান ঘটিল—সেই রাত্রেই তিনি তাঁহার নিজের সম্বন্ধে নরেনের সকল সন্দেহ ঘুচাইয়া দিলেন। নরেন তাঁহার বিছানার ধারে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ভাবিতেছিলেন—ইনি বল্‌তেন ইনি অবতার, এখন যদি সে কথা বলেন তবে বিশ্বাস করি; পরমহংসদেব তাঁহার মনোভাব জানিতে পারিয়া বলিলেন,—'ওরে, এখনো বিশ্বাস হল না! যে রাম সে ই কৃষ্ণ, ইদানিং সে ই রামকৃষ্ণ। বেদান্তের অর্থে নয়—সত্যি, সত্যি' নরেনের উপর তাঁর অন্যান্য শিষ্যদের ভার দিয়া এবং নিজের শক্তি তাঁহাকে দিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

পরিব্রাজক বেশে

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সমাধির পর তাঁহার সন্ন্যাসী ভক্তেরা কোথায় থাকিবেন তাহা লইয়া কিছু গোল বাধিল। নরেনের উপর তাঁহার আদেশ ছিল, তাঁহার যে সব শিষ্য ত্যাগী তাহারা যেন একত্র থাকে, আর এই একত্র রাখিবার ভার দিয়া গিয়াছিলেন নরেনের উপর। কেহ এদিক্ ওদিক্ বেড়াইতে গেল সে আলাদা কথা, সে শুধু বেড়ান, কিন্তু থাকিতে হইবে সাধারণতঃ একস্থানে এবং সেইখানেই সাধন ভজন যাহা কিছু করিতে হইবে; কারণ তাঁহার মতে, এক পূর্ণসিদ্ধ যিনি—তিনিই ইতস্ততঃ বেড়াইতে পারেন। সিদ্ধি যতক্ষণ না হইতেছে ততক্ষণ একস্থানে বসিয়া সাধনে নিমগ্ন হওয়া উচিত। দেহাদিভাব যতক্ষণ না চলিয়া যায় ততক্ষণ এক যায়গায় বসিয়া সাধন ভজন করিতে হইবে, তাহার পর যে বেড়ান, সেও লোকহিতের জন্য। এই সব ভক্তের মধ্যে অনেকে বি, এ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন, অভিভাবকেরা তাঁহাদিগকে বুঝাইলেন, যখন এতদিনই গেল, তখন আর কয়েক মাসের জন্য আপত্তি কেন? বি, এ পাশ করিয়া সন্ন্যাসী হইলেই চলিবে। কে খরচ জোগাইবে তাহা লইয়াও মুস্কিল। শেষে নরেন নিজে বাড়ীতে বাড়ীতে গিয়া সকলকে বুঝাইতে লাগিলেন, তোরা কি শেষে পাসের মায়ায় ভুলে গেলি? তিনি কি এই জন্যই এত কষ্ট সয়ে গেছেন? তাঁহার কথা শুনিয়া অন্যান্য শিষ্যদের চৈতন্যোদয় হইল, অভিভাবকদের কথা না



মানিয়াই তাহারা বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া আসিল, বরাহনগরে একটি পুরাণো বাড়ী ভাড়া লওয়া হইল, দুই তিন জন গৃহী ভক্ত খরচের ব্যবস্থা করিলেন, সন্ন্যাসীদের রীতিমত সাধন ভজন চলিতে লাগিল। নরেন এই সময় তাঁহাদের দলপতি। নিত্য ধ্যান, ভজন, শাস্ত্রপাঠ—এই সব চলিত। ত্যাগের আনন্দে বিভোর হইয়া তাঁহারা দিন কাটাইতেন। কত জায়গা হইতে কত পণ্ডিত আসিত, কেমন সুখে শাস্ত্রালোচনা হইত। শ্রীরামকৃষ্ণের ভস্মাবশেষ অস্থি এবং তাঁহার গদি ও প্রতিকৃতি নিত্য পূজা পাইতে লাগিল। এইরূপে কিছুদিন চলিল, তার পর একে একে মঠ ছাড়িয়া কিছুদিনের জন্য বাহিরে ঘুরিয়া আসিতে লাগিলেন।

সাধারণতঃ সন্ন্যাসীরা প্রায়ই ঘুরিয়া বেড়ান, বেশীদিন এক জায়গায় থাকেন না, ইহার হয়ত নানা কারণ থাকিতে পারে,—প্রথমতঃ প্রকৃতি দর্শনে মনের ভাব—শান্তি, সংযম ও ভগবৎপ্রেমের অনুকূল হয়; দ্বিতীয়তঃ কোন স্থানে আসক্তি জন্মে না; তৃতীয়তঃ, মনে এমন একটা নিঃসঙ্গ ভাব আসিয়া উপস্থিত হয় যে, মনে হয় এ জগতে অমার বুঝি কেহই নাই, সহায় সম্বল কিছুই নাই, সত্যই আমি অকিঞ্চন, আর ভগবান অকিঞ্চনেরই—"অকিঞ্চনানাং কিল তদ্ ধনং বিদুঃ।" তাহা ছাড়া, পুণ্যভূমি ভারতের তীর্থক্ষেত্র-গুলিও দেখা হয়; এবং প্রকৃত সাধু দেখিলেই সাধারণ জীবের উপকার হয়। শাস্ত্রবিহিত পরিব্রজ্যার এইরূপ অনেক কারণ আছে। সাধারণতঃ এই পরিব্রাজক অবস্থা সন্ন্যাসীর পক্ষে স্বাস্থ্যকর ও স্বাস্থ্যের পরিচায়ক, হিন্দীতে একটি প্রবাদ আছে—

রমতা সাধু ও বহতা পাণি—এ দুইটি জিনিষই ভাল। কোন্ জল ভাল? না, যাহা বহিতেছে, যাহাতে স্রোত আছে; আর কোন্ সাধু ভাল? না, যিনি ঘুরিয়া বেড়ান।

যাহাই হউক, মঠে কিছুদিন থাকিবার পর সন্ন্যাসীরা আশ্রম ছাড়িয়া একে একে ঘুরিয়া আসিতে লাগিলেন। স্বামীজি (নরেন্দ্রনাথকে এখন হইতে এই নামই দিব) কয়েকবার মঠ ছাড়িয়া গেলেন, কিছুদিন বাহিরে থাকিয়া আবার ফিরিয়া আসিলেন--এমনি ভাবে চলিতে লাগিল। একবার অযোধ্যা হইতে বৃন্দাবনে গেলেন, সেখানে কিছুদিন থাকিয়া আবার মঠে আসিলেন। এই সময়ে (১৮৮৮ ইং সাল) মঠ ছিল বরাহনগরে। স্বামীজির বড় ইচ্ছা ছিল, অষ্টাধ্যায়ী পাণিনি অভ্যাস করিয়া মঠের সন্ন্যাসীগণ পুনরায় বঙ্গদেশে বেদ চর্চ্চা প্রবর্ত্তিত করিতে পারেন। সেজন্য চেষ্টাও তিনি করিতেন। তাঁহারই যত্নে ও উৎসাহে পরে পণ্ডিত মোক্ষদাচরণ সামাধ্যায়ী পাতঞ্জল মহাভাষ্যের নবাহ্নিক বঙ্গভাষায় অনূদিত করেন। জলবায়ু ভাল বলিয়া কিছুদিন সিমুলতলায় ছিলেন, কিন্তু গরম বেশী পড়ায় তাঁহার যখন পেটের অসুখ হইল, তখন চলিয়া আসিতে বাধ্য হইলেন। নিজ পরিবারের দুর্দ্দশা দেখিয়া ও সাধনাক্ষেত্রে নানা বাধা পাইয়া তিনি বড়ই কষ্টে ছিলেন, এক পত্রে লিখিয়াছেন—"আমি আদর্শ শাস্ত্র পাইয়াছি, আদর্শ মনুষ্য চক্ষে দেখিয়াছি, অথচ পূর্ণভাবে নিজে কিছু করিয়া উঠিতে পারিতেছি না, ইহাই অত্যন্ত কষ্ট।" শরীরও তাঁহার বড় ভাল ছিল না। কাশীধামে যাইবার জন্য তাঁহার মন বহু বার ছুটিয়াছিল, কিন্তু হইয়া উঠে নাই;

অবশেষে ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে যদি বা যাত্রা করিলেন, কিন্তু বৈদ্যনাথ হইতে খবর পাইলেন, তাঁহার এক গুরুভ্রাতা চিত্রকূট, ওঙ্কারনাথ প্রভৃতি স্থান দর্শন করিয়া বসন্তরোগে আক্রান্ত হইয়াছেন। এই খবর পাইয়া তিনি এলাহাবাদে গেলেন এবং সেবাশুশ্রূষা দ্বারা তাঁহাকে সুস্থ করিলেন। পরে কাশী হইয়া গাজীপুর গেলেন। তাঁহার খুব ইচ্ছা ছিল গাজীপুরের পওহারী বাবাকে দেখিবেন। এই সাধুটির নাম দেওয়া হইয়াছিল পওহারী বা 'পবনাহারী', কারণ তিনি বিশেষ কিছুই খাইতেন না। গাজীপুর জায়গা তাঁহার বেশ ভাল লাগিল, কিন্তু বাবাজীর সহিত দেখা করিতে কিছু বেগ পাইতে হইল। সাধুর ভক্তি ও যোগ দেখিয়া স্বামীজি তাঁহার শরণ লইলেন। লোককে দেখা দেন না, দরজার আড়াল হইতে কথা বলেন, ভারী মিষ্ট কথা, বিনয়ের মূর্ত্তি, অদ্ভুত গুরুভক্তি ও ঈশ্বরে নির্ভর, অদ্ভুত তিতিক্ষা ও বিনয়--এই সব দেখিয়া স্বামীজি খুব মুগ্ধ হইলেন। পওহারী বাবার কাছে আবার দীক্ষা লইবেন ভাবিয়াছিলেন কিন্তু তাহা আর হইল না, এক পত্রে দেখিতে পাই,—লিখিয়াছেন, "কোথায় আমি তাঁহার দ্বারে ভিখারী, না তিনি আমার কাছে শিখিতে চাহেন? বোধ হয় ইনি এখনও পূর্ণ হয়েন নাই, কর্ম্ম, ব্রত এবং আচার অত্যন্ত, এবং বড় গুপ্ত ভাব। সমুদ্র পূর্ণ হইলে কখনও বেলাবদ্ধ থাকিতে পারে না, নিশ্চিত।" তখনও স্বামীজির মনে শান্তি আসে নাই। তাঁহার এক বন্ধুকে লিখিয়াছেন, "আমার মানসিক অবস্থা আপনাকে কি বলিব, মনের মধ্যে নরক দিবা-রাত্রি জ্বলিতেছে, কিছুই হইল না, এ জন্ম বুঝি বিফলে গোলমাল

করিয়া গেল, কি করি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।” ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল বা মে মাসে বরাহনগর মঠে ফিরেন এবং এই সময়ে তাঁহাকে মঠ লইয়া বিশেষ ব্যস্ত দেখিতে পাই।

কিন্তু দুই এক মাস পরেই তিনি আবার বাহির হইলেন, এবার হিমালয় যাত্রা। কাশী, নৈনিতাল, কাঠগোদাম, আলমোড়া, শ্রীনগর, টিহিরি, দেরাদুন হইয়া হৃষীকেশ আসিলেন। এ সময়ে তাঁহার শরীর বড় অসুস্থ হয়, নাড়ী ছাড়িয়া যায়, নিকটে ডাক্তার কবিরাজ কেহ নাই। তাঁহার গুরুভাইয়েরা সব নিরাশ হইয়া বসিয়া আছেন। তখন এক মহাপুরুষ আসিয়া ঔষধ দিলেন, তাহাতেই তাঁহার আরোগ্য লাভ হয়। মীরাটে তিন মাস থাকিয়া সঙ্কল্প করেন, একা বেড়াইতে যাইবেন, কাহাকেও সঙ্গে লইবেন না, কারণ গুরুভাইয়ের মায়াও মায়া, সে বরং সোণার শিকল। জানুয়ারী মাসে সকলকে ছাড়িয়া দিল্লী গেলেন। দিল্লীতেও তাঁহার গুরুভাই একজন তাঁহার পিছনে পিছনে যান, তখন তিনি জোর করিয়া তাঁহার নিকট হইতে পলায়ন করেন।

এই সময় হইতে প্রায় আড়াই বৎসর তাঁহার কেমন করিয়া কাটে তাহা পরে নানা উপায়ে জানা গিয়াছে। এখন তিনি একা বেড়াইতে লাগিলেন। প্রথমে রাজপুতনা, পরে দক্ষিণ ভারত, স্বামীজির চরণে নত হইল। আলোয়ারের মহারাজা, খেতুড়ীর রাজা, পোরবন্দরের মহারাজা, মহীশূরের রাজা, রামনাদাধিপতি—তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও অদ্ভুত বিবেক-বৈরাগ্য দেখিয়া

শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। জয়পুর, আমেদাবাদ, ওয়াড্‌ওয়ান, লিম্‌ড়ী, জুনাগড়, ভুজরাজা, দ্বারকা, মাণ্ডবী, থাণ্ডোয়া, পুনা, বেলগাম,—সর্ব্বত্রই তাঁহার পায়ের ধূলা পড়িল, তাঁহার আগমনে একটা চাঞ্চল্য দেখা দিল। আলোয়ার-মহারাজের সঙ্গে তাঁর প্রথমে যে কথাবার্ত্তা হয় তাহা এখানে উল্লেখযোগ্য। মহারাজ স্বামীজির সহিত দেখা হইলে বলিলেন, "আচ্ছা স্বামীজি মহারাজ, শুনেছি আপনি অসাধারণ পণ্ডিত, তবে আপনি কিছু কাজ কর্ম্ম না করে গেরুয়া পরে ঘুরে বেড়ান কেন?" তাহাতে স্বামীজি উত্তর করেন, "আচ্ছা মহারাজা, আপনি রাজকার্য্য ফেলে সাহেবদের পেছনে শিকার করতে ছুটে বেড়ান কেন?" মহারাজা একটু ভাবিয়া উত্তর দিলেন, "কেন করি তা বল্‌তে পারি না, তবে আমার ভাল লাগে বলেই ওরূপ করি।" স্বামীজি বলিলেন, "আমারও গেরুয়া পরে বেড়াতে ভাল লাগে বলেই বেড়াই।" তারপর মহারাজা মূর্ত্তিপূজার কথা পাড়িলেন, বলিলেন, "আপনারা মূর্ত্তিপূজা করেন কি বলিয়া? আমি ত ইট কাঠ পাথরের মধ্যে কিছু খুঁজিয়া পাই না।" স্বামীজি বলিলেন, "যাহার যেমন অভিরুচি।" এই বলিয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন, পরে দেওয়ালে মহারাজের একখানি ফটো ঝুলিতেছিল তাহা একজনকে আনিতে বলিলেন। সে ফটোটা আনিয়া স্বামীজির হাতে দিলে তিনি সভার সকলকে বলিলেন, এখন তোমরা কেহ আসিয়া ইহার উপর থুথু ফেল, ইহা ত একখণ্ড কাগজ। সকলে ত অবাক্, দেওয়ান মেজর রামচন্দ্রজি বলিলেন, "স্বামীজি আপনি বলিতেছেন কি? থুথু ফেলিব কোথায়? এ যে

আমাদের মহারাজের ফটো।” স্বামীজি অম্লান বদনে উত্তর দিলেন,—“তাতে কি? উহাতে ত আর আপনাদের মহারাজা বসিয়া নাই, ও ত এক টুক্‌রা কাগজ মাত্র।” তখন মহারাজার দিকে চাহিয়া বলিলেন,—“দেখুন মহারাজ, এই ফটো এক টুক্‌রা কাগজ হইলেও, কেহ উহাতে থুথু ফেলিতে চাহিতেছে না, সকলে ভাবে যে উহাতে আপনার অমর্য্যাদা হইবে, উহা এক টুক্‌রা কাগজ বলিয়া কেহ দেখে না, উহার মধ্যে আপনাকেই দেখিতে পায়। তেমনি, পাথর বা অন্য আকারে যাহারা মূর্ত্তি পূজা করে তাহারা তাহার মধ্যে ইট, কাঠ, পাথর দেখে না, ভগবান্‌কেই দেখিতে পায়। আপনি কি কাহাকেও এই বলিয়া পূজা করিতে দেখিয়াছেন, “হে পাথর, হে কাঠ, আমি তোমার পূজা করি,” তখন মহারাজের চোখ খুলিল।

একবার রেলগাড়ীতে দুইজন সাহেব স্বামীজিকে দেখিয়া সাধুদের যথেচ্ছা নিন্দা করিয়া যাইতেছিল, স্বামীজি সব চুপ চাপ শুনিয়া গেলেন। এমন সময়ে এক ষ্টেশনে গাড়ী থামিলে তিনি ইংরাজীতে ষ্টেশনমাষ্টারের কাছে এক গ্লাস জল চাহিলেন। তখন সাহেব দুজনা ভারী আশ্চর্য্য হইল, এই হিন্দু ফকির ইংরাজী জানিয়াও কি করিয়া এই সব গালি খাইয়া শান্ত ছিলেন তাহা জিজ্ঞাসা করিল। তিনি উত্তর দিলেন, তোমাদের মত নির্ব্বোধ আমি অনেক দেখেছি, তাই চুপ করে ছিলাম। সাহেবরা তখন গালি খাইয়া ঘুসি মারিতে উঠিল, স্বামীজিও আস্তিন গুটাইয়া অগ্রসর হইলেন। তাঁহার ঘুসির পরিমাণ দেখিয়া তাহারা বুঝিল, সুবিধা হইবে না, তখন তাহারা ক্ষমা চাহিল।

পোরবন্দরের মহারাজের কাছে স্বামীজি ৮।৯ মাস ছিলেন, সে সময়ে রাজসভায় একজন বড় পণ্ডিত ছিলেন, তাঁহার নাম শঙ্কর পাণ্ডুরঙ্গ। তাঁহার সাহায্যে স্বামীজির ফরাসী ভাষা শিখার সুযোগ হয়। এইরূপে প্রব্রজ্যার সময়েই তিনি পাণিনি ব্যাকরণ ও প্রাচ্য দর্শনে অধিকার লাভ করেন। ভ্রমণকালে ভারতের দরিদ্র জনসাধারণের দুর্দ্দশা দেখিয়া এই সময় তাঁহার হৃদয় দুঃখে বিগলিত হয়, ভারতের দারিদ্র্য আর অজ্ঞতা তাঁহাকে চিন্তাকুল করিয়া তোলে। এক পত্রে তিনি এই সময়ের মনের ভাব কিছু প্রকাশ করিয়াছেন ;—Cape Comorin-এ (কন্যাকুমারিকাতে) মা কুমারীর মন্দিরে বসিয়া—ভারতবর্ষের শেষ পাথর টুক্রার উপর বসিয়া তাঁহার মনে হইল, এই যে আমরা এতজন সন্ন্যাসী আছি, ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্চি, লোককে দর্শন শিক্ষা দিচ্ছি, এ সব পাগলামি। খালি পেটে ধর্ম্ম হয় না—গুরুদেব বল্‌তেন না, ঐ যে গরীবগুলো পশুর মত জীবন যাপন কর্‌ছে, তার কারণ মূর্খতা ; আমরা আজ চার যুগ ওদের রক্ত চুষে খেয়েছি, আর দু'পা দিয়ে দলেছি।" এই চিন্তা স্বামীজিকে আকুল করিয়া তুলিল। তিনি উপায় স্থির করিলেন, পাশ্চাত্যে—ইউরোপ আমেরিকার কাছে—ধর্ম্মপ্রচার করিতে হইবে, তবে যদি কিছু হয়, তবে যদি দরিদ্রের উপর অত্যাচার বন্ধ হয়। তাঁহার অসাধারণ আধ্যাত্মিক শক্তি দেখিয়া অনেকে আপনা হইতে এই কথার প্রস্তাব করে এবং দেশীয় রাজাদের মধ্যে অনেকে, এমন কি নিজামবংশীয় কেহ তাঁহাকে টাকা কড়ি দিয়া আমেরিকা যাওয়ার সাহায্য করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। যাত্রার পূর্ব্বে খেতড়ির পণ্ডিত শঙ্করলালকে

পত্রে এই কথাই জানাইয়াছিলেন। "আমাদিগকে ভ্রমণ করিতেই হইবে, আমাদিগকে বিদেশে যাইতেই হইবে। আমাদিগকে দেখিতে হইবে, অন্যান্য দেশে সমাজযন্ত্র কিরূপে পরিচালিত হইতেছে। আর যদি আমাদিগকে যথার্থই পুনরায় এক জাতিরূপে গঠিত হইতে হয়, তবে অপর জাতির চিন্তার সহিত আমাদের অবাধ সংশ্রব রাখিতে হইবে। সর্ব্বোপরি, আমাদিগকে দরিদ্রের উপর অত্যাচার বন্ধ করিতে হইবে।" অবশেষে যাওয়া স্থির হইল। এই সময়ে, একদিন তিনি পথে আসিতে আসিতে আবৃত্তি করিতেছিলেন,—"অভিমানং সুরাপানং গৌরবং ঘোররৌরবম্। প্রতিষ্ঠা শূকরী বিষ্ঠা তস্মাদেতত্রয়ং ত্যজেৎ।" এমন সময় দূরে দুইজন গুরুভাইয়ের সঙ্গে দেখা হইল। তাঁহাদের সহিত অনেক কথাবার্ত্তার পর বলিলেন, "এবার দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছি। আর তোদের দেশে আছেই বা কি? দুই চারখান পুঁথি পাতড়া বই ত নয়? সে সব এবার সাগর পার করে দিয়ে আস্‌ব। সত্যি, ধর্ম্ম টর্ম্ম আর কিছু বুঝি না, তবে এইখানটায় (বুকে হাত দিয়া) বড্ড feel কর্চ্ছি।" এমন ভাবে কথা কয়টি বলিলেন যে গুরুভাইদের মনে হইল, সাক্ষাৎ করুণার প্রতিমূর্ত্তি। ইহাকে যদি ধর্ম্ম না বলে ত আর কাহাকে বলে?

মান্দ্রাজেই তাঁহার বেশী শিষ্য জোটে। তাঁহাদের মধ্যে দুইজনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য—আলাসিঙ্গা পেরুমল ও কিডি। আলাসিঙ্গা আমেরিকা যাত্রার বিষয়ে বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন, আর কিডি ছিলেন প্রথমে নাস্তিক, পরে স্বামীজির ভক্ত হইয়া পড়েন।

বোম্বে হইয়া আমেরিকা যাইবার কিছু পূর্ব্বে আর একটি ঘটনা ঘটে। একবার রেলওয়ে ষ্টেশনে একজন বাঙ্গালী ভদ্রলোক তাঁহাকে উঠাইয়া দিতে আসেন। ফাষ্টক্লাসে সকলে বসিয়া কথাবার্ত্তা হইতেছে, এমন সময় একজন ফিরিঙ্গী রেলকর্ম্মচারী আসিয়া টিকিট চাহিল এবং যিনি স্বামীজিকে উঠাইয়া দিতে আসিয়াছিলেন তাঁহাকে গাড়ী হইতে নামিয়া যাইতে বলিল। গাড়ী ছাড়িবার তখনও ঢের দেরী। দুইজনে ক্রমেই ঝগড়া বাধিয়া উঠে দেখিয়া স্বামীজি তাঁহার শিষ্যকে বার বার থামিতে বলেন; কিন্তু একটা হিন্দু সন্ন্যাসী সাহেবের কথায় কথা বলে দেখিয়া টিকিট কলেক্টর গরম হইয়া উঠিল। তখন স্বামীজি তাহাকে ধমক দিলেন। ধমক খাইয়া সাহেব ভড়কাইয়া গেল, এবং তাঁহার সহিত কথায় ক্রমশঃই অপ্রস্তুত হইয়া পলায়ন করিল।

দিগ্বিজয়

ক্রমে যাওয়ার দিন নিকটে আসিল। ১৮৯৩।৩১শে মে তারিখে স্বামীজি আমেরিকা যাত্রা করিলেন। খেতড়ি মহারাজার প্রাইভেট সেক্রেটারী তাঁহাকে জাহাজে তুলিয়া দিয়া গেলেন।

৩১শে মে তারিখ স্বদেশ ছাড়িয়া কলম্বো, সিঙ্গাপুর, হংকং হইয়া স্বামীজি জাপানে পৌঁছিলেন। তিনি এখন বিবেকানন্দ নাম গ্রহণ করিলেন। আমেরিকা পৌঁছিবার পূর্ব্বে পথে ইয়াকো-হামা হইতে তাঁহার মান্দ্রাজী শিষ্যদিগকে এক দীর্ঘ পত্র লিখেন, তাহাতে তাঁহার স্বদেশপ্রেমের কথা, তাঁহার উৎসাহ-অনলের চিহ্ন সর্ব্বত্র স্পষ্ট। এই পত্রের কিছু কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত না করিয়া পারিলাম না। "তোমরা কি কোচ্চো? সারা জীবন কেবল বাজে বোক্‌চো। এস, এদের দেখে যাও, তার পর যাও, গিয়ে লজ্জায় মুখ লুকাও গে। আর তোমরা এমন কোর্‌ছোই বা কি? আহাম্মক, তোমরা বই হাতে কোরে সমুদ্রের ধারে পাইচারি কোর্‌ছো...এস, মানুষ হও। নিজেদের সঙ্কীর্ণ গর্ত্ত থেকে বেরিয়ে এসে, বাইরে গিয়ে দেখ, সব জাতি কেমন উন্নতির পথে চলেছে। তোমরা কি মানুষকে ভালবাসো? তোমরা কি দেশকে ভালবাসো? তা হলে এস, আমরা ভাল হবার জন্য, উন্নত হবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করি। পেছনে চেয়ো না—অতি প্রিয় আত্মীয় স্বজন কাঁদুক; পেছনে চেয়ো না—সামনে এগিয়ে যাও।"
বিবেকানন্দ জাপান হইতে বঙ্কুবার এবং সেখান হইতে রেলযোগে

কানাডা দিয়া রকি পাহাড় পার হইয়া চিকাগোয় পৌঁছিলেন। যে সাধু শুধু দণ্ড, কমণ্ডলু ও দুই একখানা পুঁথি লইয়া পদব্রজে সারা ভারত বেড়াইয়াছিলেন, যাঁহার বিষয় সম্পত্তির মধ্যে ছিল শুধু দীর্ঘ দণ্ড, এক কমণ্ডলু ও কম্বল, তাঁহাকে বড় বড় বাক্স ও বিছানা লইয়া সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া আসিতে হইল, ইহাতে তিনি প্রথমে বড় মুস্কিলে পড়িলেন। আমেরিকায় আসিয়া তাঁহাকে বড়ই অসুবিধায় পড়িতে হইল, বিশেষতঃ কালা আদ্মি ও বিচিত্র বেশ বলিয়া। ক্ষুধা পাইয়াছে, হোটেলে গিয়া খাইবেন, কিন্তু হোটেলওয়ালা তাঁহাকে বাহির করিয়া দিতেছে—বলিতেছে, খাওয়ার যায়গা নাই! আপত্তি করিলে স্পষ্ট বলে, তুমি কালা আদ্মি, তোমাকে এখানে বসিয়া খাইতে দিব না। দাড়ির জ্বালায় অস্থির, কিন্তু নাপিত চেহারা দেখিয়াই বলিয়া দিল, ও চেহারা এখানে চলিবে না। তিনি ভাবিলেন তবে ইংরাজের পোষাক পরিয়া আসি, কিন্তু ভাগ্যে একটী ভদ্র মার্কিনের সহিত সাক্ষাৎ হইল, তিনি বলিলেন, ওই পোষাকই ভাল কারণ উহাতে ভদ্রলোক যারা তারা কিছু বলিবে না, ইউরোপীয় পোষাক পরিলে সকলেই তাড়া দিবে। অগত্যা নিজের হাতে কামাইতে হইল। ক্ষুধার তাড়নায় পেট জ্বলিয়া গেলেও দোকানে বলিতে লাগিল, তোমাকে থাইতে দিব না, কারণ তোমার সঙ্গে যে খাবে তার জাত যাবে। স্বামীজির ইহা মন্দ লাগিত না, "বাস্ সব কালো এক জাত, আমাদের মত কোন জাত কত খানি আর্য্য তাহা লইয়া চুলচেরা বিচার নাই।" কুলি প্রভৃতির কাছে তাঁহাকে ঠকিতে হইল, চিকাগোতে গিয়া প্রথমে এক হোটেলে

উঠিলেন, কিন্তু এদিকে অত খরচে তাঁহার টাকা ফুরাইয়া আসিল। গড়ে রোজ এক পাউণ্ড করিয়া খরচ হইত। একদিন তিনি ঘটনাক্রমে চিকাগো হইতে বোষ্টনে যাত্রা করিলেন। পথে রেল গাড়ীতে এক বৃদ্ধার সঙ্গে আলাপ হইল। বুড়ি তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া বোষ্টনের নিকট এক গ্রামে তাহার বাড়ীতে আনিয়া রাখিল—তাহার অবশ্য উদ্দেশ্য, এক অদ্ভুত জীবকে বাড়ীতে যায়গা দিয়া বন্ধুবান্ধব আত্মীয় স্বজনকে দেখান; কিন্তু ফলে হইল বিপরীত। যাঁহারা আসিলেন তাঁহারা এই ভারতীয় সন্ন্যাসীর গুণে ও বিদ্যায় আকৃষ্ট হইলেন। ক্রমে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সুপণ্ডিত অধ্যাপক রাইট্ সাহেবের সঙ্গে স্বামীজির পরিচয় হইল। স্বামীজি তাঁহার কাছে আপন উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিলেন, তাহাতে অধ্যাপক মহাশয় তাঁহাকে চিকাগো ধর্ম্ম মহাসভায় বক্তৃতা করিবার পরামর্শ দিলেন, কারণ যিনি চিকাগোয় নূতন কথা বলিতে পারিবেন, দেশময় তাঁহার নাম ছড়াইয়া পড়িবে; কিন্তু স্বামীজির কাছে কোনও নিদর্শন পত্র ছিল না, তিনি যে কোনও ধর্ম্মের প্রতিনিধি তাহার কিছু প্রমাণ ছিল না; এ বাধা রাইট্ সাহেবের কাছে টিকিল না, তিনি হাসিয়া বলিলেন,—"To ask you for your credentials, Swamin, is to ask the sun its right to shine (স্বামীজি আপনার নিকট নিদর্শন পত্র চাওয়া আর সূর্য্যকে কিরণ দিবার অধিকার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা একই কথা)।" রাইট্ সাহেব তাঁহাকে সাহায্য করিলেন। তাঁহার এক বন্ধু ছিলেন ধর্ম্ম মহাসভার সহিত সংশ্লিষ্ট; তাঁহার কাছে বিবেকানন্দের কথা লিখিয়া শেষে এই পরিচয়

দিলেন, "He is more learned than all our learned professors put together (আপনার সকল অধ্যাপক-গণের বিদ্যা এক করিলেও তাঁহার বিদ্যা বেশী হইবে)।" এই পরিচয়-পত্র ও ধর্ম্ম-মহাসভার ঠিকানা লইয়া স্বামীজি চিকাগোয় ফিরিলেন, কিন্তু দৈবক্রমে ঠিকানাটি হারাইয়া গেল। কোথাও আশ্রয় না পাইয়া এবং ধর্ম্ম-মহাসভার ঠিকানা পর্য্যন্ত কেহ না বলিয়া দেওয়ায় স্বামীজি হতাশ হইয়া রাস্তার ধারে বসিয়াছিলেন, এমন সময়ে পাশের একবাড়ী হইতে জনৈক ভদ্রমহিলা বাহির হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি ধর্ম্মসভার প্রতিনিধি কিনা। বিবেকানন্দ তাঁহাকে সব অবস্থা খুলিয়া বলিলে তিনি স্বামীজিকে সঙ্গে করিয়া নিজ গৃহে লইয়া গেলেন, পরিচর্য্যার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন, এবং যাহাতে মহাসভায় পৌঁছিতে পারেন তাহারও উপায় করিলেন।

চিকাগো ধর্ম্ম-মহাসভা ছিল এক প্রকাণ্ড ব্যাপার। ইহার উদ্দেশ্য ছিল - সকল ধর্ম্মের মধ্যে রোমান্ ক্যাথলিক নামক খ্রীষ্টিয়ান্ ধর্ম্মের শাখার শ্রেষ্ঠত্ব দেখান, এবং ইহার প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন রোমান্ ক্যাথলিকেরা। কয়েক বৎসর ধরিয়া ইহার যোগাড় চলিতেছিল, এবং ইহাতে বহুতর প্রবন্ধ (প্রায় সহস্রেরও অধিক) পড়া হইয়াছিল। স্বামীজি ইহার পূর্ব্বে কখনও সাধারণের সমক্ষে বক্তৃতা করেন নাই, তাঁহাকে ভিন্নদেশী, ভিন্নভাষী, সুশিক্ষিত ও সুসজ্জিত ৬।৭ সহস্র নরনারীর সম্মুখে হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে হইবে! তাঁহার বলিবার পালা আসিলে 'পরে বলিব' এই বলিয়া কিছুক্ষণ দেরী করিলেন, কিন্তু সভাপতি

মহাশয় জিদ ধরিলেন যে যদি তিনি বলিতে চান তবে আর দেরী করিতে পাইবেন না, তখন তিনি অগত্যা উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং Sisters and Brothers of America (আমেরিকার ভাই ভগ্নীগণ) বলিয়া আরম্ভ করিলেন। এই প্রথম বক্তৃতাতেই যথেষ্ট ফল হয়, সকলে তাঁহার বাগ্মিতার ও উদার প্রাণের পরিচয় পাইয়া উৎফুল্ল হইল। ইহার পর হইতেই তিনি লোকপ্রিয় বক্তা বলিয়া গণ্য হইলেন। অন্যান্য ব্যক্তিদিগকে সাধারণতঃ আধ ঘণ্টা সময় দেওয়া হইত, তার চেয়ে তাঁহাকে অনেক অধিক সময় দেওয়া হইয়াছিল। আর ভাল বক্তাদিগকে বলিতে দেওয়া হইত সকলের শেষে—স্বামীজি ও বৌদ্ধপ্রচারক ধর্ম্মপাল প্রভৃতি এই ভাল বক্তাদের দলে পড়িয়াছিলেন। তাঁহাদের কথা শুনিবার জন্য লোকে ১০টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত বসিয়া থাকিত। চিকাগো ধর্ম্ম-মহাসভায় ইহা ছাড়া আর কয়েকটি বক্তৃতা করিয়াছিলেন,—(১) আমরা বিবাদ করি কেন, (২) হিন্দুধর্ম্ম, (৩) ধর্ম্মই ভারতের প্রধান অভাব নয়, এবং (৪) বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্ম্ম। ইহার পর তাঁহার নাম ছড়াইয়া পড়িল। এই বিচিত্রবেশী কান্তদেহ মিষ্ট-ভাষী হিন্দু সন্ন্যাসীর নাম সমস্ত আমেরিকা জানিতে পারিল। গোঁড়া মিশনারীর দল ইহাতে কিন্তু খাপ্পা হইয়া উঠিল, তাহারা উঠিয়া পড়িয়া চেষ্টা করিতে লাগিল কিসে বিবেকানন্দকে অপদস্থ করিতে পারা যায়। তাহাদের চটিবার কারণও ছিল। স্বামীজি চিকাগো বক্তৃতার পরে প্রায়ই নানা স্থানে বক্তৃতা দিয়া আমেরিকার লোককে বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন যে ভারতের প্রধান অভাব অন্নের, ধর্ম্ম এখানে যথেষ্ট আছে, সুতরাং মিশনরী-

দের টাকা দেওয়ায় ভারতের কোনই উপকার নাই। আর, ভারতকে যেরূপ কুসংস্কারাচ্ছন্ন বলিয়া বর্ণনা করা যায়, প্রকৃতপক্ষে তাহা সব মিথ্যা। স্বামীজির এই সব প্রচারের ফলে মিশনরীদের বার্ষিক দেড়কোটি টাকা আয় কমিয়া গেল, সুতরাং তাহারা শোধ লইবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিল—রটাইতে লাগিল, বিবেকানন্দ অসচ্চরিত্র এবং লোভী। বিবেকানন্দ ইহাতে ভ্রূক্ষেপও করিলেন না, কারণ তিনি জানিতেন, "লোক, না, পোক।" তাদের কথায় কি আসে যায়। শুধু মিশনারী নয়, আমাদের দেশের পরশ্রীকাতর লোকেও তাঁহার কুৎসা ছড়াইতে লাগিল; কিন্তু এই তেজস্বী মহাপুরুষের দীপ্তচরিত্র-প্রভাবে সে সব নিন্দাবাদ দূরে পলায়ন করিল। স্বামীজি ইহাতে বিচলিত হন নাই, তাঁহার গুরুভাই ও শিষ্যদিগকে পত্র লিখিতেন, "এই কথা মনে রেখ, দুটো চোক, দুটো কাণ, কিন্তু একটা মুখ। উপেক্ষা, উপেক্ষা, উপেক্ষা। নহি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি। (হে তাত, কল্যাণকারীর কখনও দুর্গতি হয় না)। ভয় কার? কাদের ভয়রে ভাই? এইখানে মিশনারি ফিশনারি চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ক্ষান্ত হয়ে গেছে। অমনি সকলি জগৎ হবে।

নিন্দন্তু নীতিনিপুণাঃ যদি বা স্তবন্তু,
লক্ষ্মীঃ সমাবিশতু গচ্ছতু বা যথেষ্টম্।
অদ্যৈব মরণমস্তু যুগান্তরে বা,
ন্যায়াৎ পথঃ প্রবিচলন্তি পদং ন ধীরাঃ॥

(নীতি-নিপুণ ব্যক্তিগণ নিন্দাই করুন আর প্রশংসাই করুন, লক্ষ্মী থাকুক আর যাক, আজই কিম্বা যুগান্তরে মরণ হউক,

ধীরগণ ন্যায়পথ হইতে পদমাত্র বিচলিত হন না।) "বালকবুদ্ধি জীবে কে কি বলিতেছে, তাহার খবর মাত্রও লইবে না।" "ওদের মতামতে কি আসে যায়রে ভাই ? তোরা আপনার কাজ করে যা, মানুষের মুখ কি দেখিস্, ভগবানের মুখ দেখ্।" "জয় প্রভু আমি কিছুই জানিনা। সত্যমেব জয়তে নানৃতং, সত্যেনৈব পন্থা বিততো দেবযানঃ। (সত্যই জয়লাভ করে মিথ্যা নয়, সত্যের দ্বারাই দেবযান পন্থা বিস্তৃত হইয়াছিল)। বিগতভীঃ হওয়া চাই। কাপুরুষে ভয় করে, আত্মসমর্থন করে। আমাদের মধ্যে কেহও যেন আমাকে সমর্থন করিতে অগ্রসর না হয়। দাদা, কুকুর বেড়ালের ঝগড়া দেখে মানুষে কি দুঃখু করে ? তেমনিই সাধারণ মানুষের ঈর্ষ্যা, হিংসা, গুঁতাগুঁতি দেখে তোমাদের মনে কোনও ভাব হওয়া উচিত নয়।" এই ভাব লইয়া তিনি বরাবর চলিয়াছেন। তাঁহার নাম এতদূর ছড়াইয়া পড়িল যে আহারে বিহারে 'বিবেকানন্দ ফাসন' বলিয়া এক পৃথক কায়দার সৃষ্টি হইল। এইরূপ সমাজে একটা তুমুল ঝড় আনিলেন বলিয়া, এক প্রচণ্ড আন্দোলন উঠাইলেন বলিয়া, লোকে তাঁহার আখ্যা দিল 'সাইক্লোনিক (ঝড় উৎপাদনকারী) হিন্দু'। এক বক্তৃতা-কোম্পানি তাঁহাকে দিয়া বক্তৃতা দেওয়াইয়া যথেষ্ট টাকা রোজগার করিতে লাগিল। তাঁহার মনে ধারণা করিয়া দেওয়া হইয়াছিল যে টাকা দিয়া বক্তৃতা না দিলে কেহ শুনিতে আসিবে না। এই ধারণায় তিনিও প্রথমে রাজি হইয়াছিলেন, কিন্তু পরে দেখিলেন টাকা নিয়া বক্তৃতা করার কোন সুফল নাই, বরং কোম্পানী নেহাৎ দোকানদারি করিতেছে, ৭।৮ হাজার টাকার টিকিট বিক্রয় করিয়া তাঁহাকে ৪।৫

শত টাকা মাত্র দিতেছে, তখন তিনি ঐ কোম্পানীর সংস্রব ছাড়িয়া নিজেই বক্তৃতা দিতে লাগিলেন। সমস্ত আমেরিকা ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, তবে কেন্দ্র হইল চিকাগো। এখন বক্তৃতা কমাইয়া রীতিমত অধ্যয়নের ও কর্ম্মের ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। এই সময়ে নিউইয়র্কে তিনি কতকগুলি বক্তৃতা দেন—জ্ঞানযোগ ও রাজযোগ সম্বন্ধে।

ইহার পর ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে তিনি ইংলণ্ডে যান, সেখানে ধর্ম্ম-প্রচারের সুযোগ কতদূর সে বিষয়ে সন্ধান লইবার তাঁহার ইচ্ছা ছিল। দেশের বিভিন্ন স্থানে কেন্দ্র স্থাপন করিবার প্রবল আগ্রহ ইতিপূর্ব্বেই তাঁহার মনে উপস্থিত হইয়াছিল, এবং তিনি তাহার জন্য দেশের শিষ্য ও গুরুভাইদিগকে সর্ব্বদা উৎসাহ দিয়া পত্র লিখিতেন। বিলাতে গিয়া দেখিলেন, আমেরিকার মত নয়, টাকার নাম শুনিলেই লোকে পলায়। "ইংরাজেরা লেক্‌চার ফেক্‌চার শুনতে একটি পয়সাও দেয় না। যদি শুনতে আসে ত তোমার ভাগ্যি, যেমন আমাদের দেশে।" "এখানে লেক্‌চারে আমাদের দেশের মত উলটে ঘর থেকে খরচ করতে হয়। তবে অনেকদিন করলে ও খাতির জমে গেলে খরচটা পুষিয়ে যায়।" এই সময়ে গুরুতর পরিশ্রমে তাঁহার স্বাস্থ্য হানিও ঘটিতেছিল। ইংলণ্ডে তিনমাস থাকিয়া ডিসেম্বরে তিনি আমেরিকায় ফিরিয়া আসেন এবং কর্ম্মযোগ প্রচার করেন। অনেকের মতে কর্ম্মযোগ তাঁহার শ্রেষ্ঠ রচনা। এই সময়ে কর্ম্মযোগ ও ভক্তিযোগ উভয় পুস্তকই লিখেন। স্বামীজি কখনও তাঁহার গুরুদেব শ্রীরামকৃষ্ণের নাম প্রচার করিতে ব্যস্ত হন নাই, আমেরিকানরা তাঁহার গুরু-

দেবের কথা জানিতে আগ্রহ প্রকাশ করায় তিনি 'মদীয় আচার্য্য-দেব' সম্বন্ধে এই সময়ে এক বক্তৃতা দেন। ইহার সর্ব্বত্র তাঁহার প্রগাঢ় গুরুভক্তি প্রকাশ পাইতেছে। এই ভক্তি সে সময়ের অনেক পত্রে ব্যক্ত হইয়াছে। "ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জন্মেছিলেন কি না জানি না, বুদ্ধ চৈতন্য প্রভৃতি একঘেয়ে, রামকৃষ্ণ পরমহংস the latest and the most perfect (সর্ব্বাপেক্ষা অধুনাতম এবং পূর্ণ), জ্ঞান, প্রেম, বৈরাগ্য, লোকহিতচিকীর্ষা উদারতার জমাট, কারুর সঙ্গে কি তাঁর তুলনা হয়। তাঁকে যে বুঝতে পারে না তার জন্ম বৃথা। আমি তাঁর জন্ম জন্মান্তরের দাস, এই আমার পরম ভাগ্য, তাঁর একটি কথা বেদ বেদান্ত অপেক্ষা অনেক বড়, তস্য দাসদাসদাসোঽহং। তবে একঘেয়ে গোঁড়ামির দ্বারা তাঁর ভাবের ব্যাঘাত হয় এইজন্য চটি। বরং তাঁর নাম ডুবে যাক— তাঁর উপদেশ ফলবান হউক।" "বেদ বেদান্ত আর আর সব অবতার যা কিছু করে গেছেন, তিনি একলা নিজের জীবনে তা করে দেখিয়ে গেছেন। তাঁর জীবন না বুঝলে বেদ বেদান্ত অবতার প্রভৃতি বোঝা যায় না। তিনি যেদিন থেকে জন্মেছেন সেদিন থেকে সত্য যুগ এসেছে। এখন সব ভেদাভেদ উঠে গেল। আচণ্ডাল প্রেম পাবে। মেয়ে পুরুষ ভেদ, ধনী নির্ধনের ভেদ, পণ্ডিত বিদ্বান্ ভেদ, ব্রাহ্মণ চণ্ডাল ভেদ, সব তিনি দূর করে দিয়ে গেলেন। আর তিনি বিবাদ-ভঞ্জন—হিন্দু, মুসলমান, ক্রিশ্চান ইত্যাদি সব চলে গেল। * * * যে তার পূজা করবে, সে অতি নীচ হলেও মুহূর্ত্তমধ্যে অতি মহান্ হবে—মেয়ে বা পুরুষ।"

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, এমন প্রগাঢ় গুরুভক্তি সত্ত্বেও তিনি গুরু-পূজা প্রচার করিতে চান নাই—সর্ব্বদাই তাঁহার মত ছিল, কাজ কথা কহুক, মুখকে চুপ করিতে বল। সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয় করিতে গিয়া যাহাতে নূতন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি না হয় সেদিকে তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। যাহার উদ্দেশ্য সাধু, সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে তাহারই সাহায্য করিতে তিনি প্রস্তুত থাকিতেন। ব্রাহ্ম-পরিচালিত ও বাবু শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত বরাহনগর হিন্দু বিধবা বিদ্যালয়ের সাহায্য-কল্পে আমেরিকায় এক বক্তৃতা দিয়া সেই অর্থ সভাপতির দ্বারা শশিপদ বাবুর নিকট পাঠাইয়াছিলেন।

আমেরিকায় ক্রমেই তাঁহার খ্যাতি ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। হার্ভার্ড, পৃথিবীর মধ্যে এক শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়। সেখানে বক্তৃতা দিতে তাঁহাকে অনুরোধ করা হয়, তিনি বেদান্ত দর্শন সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দেন। এখানে এবং কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে যথাক্রমে প্রাচ্যদর্শন ও সংস্কৃত অধ্যাপনা করিবার জন্য তাঁহাকে বলা হয়, কিন্তু তিনি সন্ন্যাসী, তাই এসব কর্ম্ম গ্রহণ করিলেন না। এই নাম-যশ তাঁহার মন টলাইতে পারিল না। তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ইউরোপকেও বিস্মিত করিয়াছিল। ম্যাক্সমূলার, ডয়্সেন প্রভৃতি পণ্ডিতেরাও তাঁহার কাছে অনেক নূতন কথা শুনিতে পাইয়াছিলেন। আমেরিকার অধ্যাপক জেম্স সাহেবও স্বামীজির সহিত আলাপ করিয়া এবং তাঁহার অগাধ জ্ঞান দেখিয়া তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হন। তাঁহার গুণগ্রামে মুগ্ধ হইয়া কত সুন্দরী মেয়ে তাঁহাকে স্বামীত্বে বরণ করিতে অভিলাষ করেন,

কত লক্ষ লক্ষ মুদ্রা তাঁহার চরণতলে আসিয়া পৌছায়, কিন্তু কাম-কাঞ্চনত্যাগীর সন্ন্যাসব্রত কিছুতেই টলিল না। বড়ই দুঃখের বিষয় এ সময়কার বক্তৃতা আমরা পাই নাই। মনে রাখিতে হইবে, একজন আমেরিকান ভক্ত কলিকাতায় বক্তৃতা শুনিয়া বলিয়াছিলেন, আমেরিকায় ইনি যে সব বক্তৃতা দিতেন তাহা ইহার চেয়ে অনেক প্রাণস্পর্শী ছিল! তাহা শুনিলে মনে হইত যেন একটা electric shock (তড়িত প্রবাহ) আসিতেছে।

আমেরিকায় আটঘাট বাঁধিয়া বিবেকানন্দ এবার প্রচারার্থ বিলাতে যাত্রা করিলেন। এবার তাঁহার বক্তৃতার প্রভাব খুব বেশী হইল। বড় বড় ঘরের মহিলারা স্থানাভাবে মেঝের উপর বসিয়া তাঁহার বক্তৃতা শুনিতে ব্যস্ত হইতেন। এইবারে ইংলণ্ডের কয়েকজন নর নারী তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন, নিবেদিতাও এই সময়েই তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।

ইংলণ্ডে যে এতদূর কার্য্য হইবে তাহা কেহই আশা করেন নাই। এমন কি শুনা যায়, রাজ-পরিবারের কেহ কেহ পর্য্যন্ত ছদ্মবেশে তাঁহার কথা শুনিতে আসিতেন। শুধু সাধারণ সমাজে নয়, পণ্ডিতমণ্ডলীতেও তাঁহার যথেষ্ট প্রতিপত্তি হয়। অধ্যাপক ম্যাক্সমূলারের সহিত এই সময় স্বামীজির ঘনিষ্ঠ পরিচয় হইয়া পড়ে। ম্যাক্সমূলার শ্রদ্ধার সহিত রামকৃষ্ণদেবের কথা শুনেন, এবং বিবেকানন্দকে যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করেন। বিলাতে জ্ঞানযোগ, রাজযোগ, ভক্তিযোগ সম্বন্ধে সুন্দর সরল ধর্ম্মব্যাখ্যা চলিতে লাগিল।

১৮৯৬ খৃঃ জুলাই মাসে গ্রীষ্মের অবকাশ আরম্ভ হইলে স্বামীজিও কিছু সময়ের জন্য অবসর লইয়া ইউরোপ বেড়াইতে বাহির হইলেন। সুইজারলণ্ড ও জর্ম্মণী বেড়ান হইল। এইবার জার্ম্মাণ অধ্যাপক পল ডয়সনের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও পরিচয় হয়। ভারতীয় দর্শন-শাস্ত্রে আচার্য্য ডয়সন বিশেষ বিচক্ষণ। ইহার পর স্বামীজি আমষ্টারডাম্ হইয়া প্রায় দুইমাস পরে ইংলণ্ডে ফিরেন। এতদিন সারদানন্দ স্বামী আমেরিকায় তাঁহার কাজ চালাইতেছিলেন, ইংলণ্ডে কাজ চালাইবার জন্য অভেদানন্দ স্বামী এই সময়ে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইংলণ্ডে কাজ খুব ধীরে ধীরে অথচ নিশ্চিতভাবে বাড়িয়া চলিল। একদিন এনি বেশান্ত স্বামীজিকে তাঁহাদের সমিতিতে ভক্তি সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। এক রাত্রি বক্তৃতা হইল, কর্ণেল অলকটও উপস্থিত ছিলেন, লণ্ডনে ষ্টার্ডি সাহেব ও মিস্ মুলার নামে দুইজন, থিওজফিষ্ট তাঁহার প্রচার কার্য্যে খুব সাহায্য করেন। এতদিন তাঁহার দেশে ফিরিবার তেমন ইচ্ছা ছিল না, কারণ বিলাতে কিছু কাজ করিলে দেশে কাজ করার দশগুণ ফল হয়, দেশের লোকের পয়সাও নাই এবং সাহস মোটেই নাই। "হাজার হাজার লোক রামকৃষ্ণ পরমহংসকে মানে, কিন্তু কেউ একটি পয়সা দেবে না— এই হচ্ছে ভারতবর্ষ। এখানে লোকের টাকা আছে, আর তারা দেয়।"—কিন্তু বিলাতে প্রচার কার্য্যের সুবিধামত ব্যবস্থা যখন হইয়া গেল, যখন দেশে সঙ্ঘবদ্ধ হইবার প্রয়োজন হইল, তখন স্বামীজি বিলাতের কর্ম্মবন্ধন ছেদ করিয়া দেশে ফিরিবার সঙ্কল্প করিলেন। ডোভার, ক্যালে, মিলান, রোম্ প্রভৃতি দেখিয়া

১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে ৩০শে ডিসেম্বর জাহাজে চড়িয়া ভারতে রওনা হইলেন।

এডেনে জাহাজ থামিলে স্বামীজি নামিয়া এক হিন্দুস্থানী পানওয়ালার দেখা পাইলেন, তখন তিনি তাহার কাছে আসিয়া বসিলেন এবং তাহার কাছ হইতে কলিকা লইয়া তামাক খাইতে ও তাহার দেশের কথা গল্প করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার ইংরাজ শিষ্যেরা আসিয়া তাঁহাকে ঐরূপ অবস্থায় দেখিতে পাইল। এইরূপ সামান্য ঘটনা হইতেই তাঁহার দেশপ্রীতির কথা জানিতে পারা যায়।

দেশে

তিন বৎসরের বেশী কাল বিদেশে বেদান্ত প্রচার করিয়া অবশেষে স্বামীজি দেশে ফিরিলেন। কুমারিকা হইতে হিমাচলের নিভৃত গিরিকন্দর পর্য্যন্ত ভারতের সর্ব্বত্র, দেশ-মাতার এই সুসন্তানের আগমনে, এই ধর্ম্মবীরের দিগ্বিজয়ে, এই কর্ম্মবীরের তপোনুষ্ঠানে, একটা সাড়া পড়িয়া গেল। সিংহলে যখন তিনি পদার্পণ করেন, তখন কলম্বোই তাঁহাকে প্রথমে বরণ করিয়া লইল। এই অসাধারণ সম্মান প্রদর্শনে স্বামীজি শুধু দেখিতে পাইলেন, ধর্ম্মই হিন্দুর চক্ষে সব চেয়ে মূল্যবান্। হিন্দু রাজপুরুষকে, যোদ্ধাকে বা ধনীকে ততটা শ্রদ্ধার চক্ষে দেখে না, যতটা সে সন্ন্যাসীকে দেখে; সাধারণ কৃষক পর্য্যন্ত তাঁহার আগমনে উল্লাসবোধ করিয়াছিল। স্বামীজি বুঝিতে পারিলেন, ভারত বাঁচিয়া আছে, বহু শতাব্দীর লাঞ্ছনা ও অপমান সহিয়াও বাঁচিয়া আছে; সে ধর্ম্মপ্রাণ বলিয়া, জগৎকে তাহার কিছু দিবার আছে বলিয়া, দর্শন ও অধ্যাত্ম বিদ্যা জগৎকে শিখাইবে বলিয়া ভারত বাঁচিয়া আছে। জড় বিজ্ঞানের সমধিক উন্নতি হইয়াছে বলিয়া আজ পাশ্চাত্য জগতে ধর্ম্মবিশ্বাসের ভিত্তি পর্য্যন্ত টলমল করিতেছে, কিন্তু ভারত তাহাকে রক্ষা করিতে অগ্রসর হইতেছে, আর সে তাহা পারিবেও, সে যে জগৎকে শিখাইবে "একং সদ্‌বিপ্রা বহুধা বদন্তি।" পরধর্ম্মে শুধু দ্বেষবর্জ্জন নহে, আন্তরিক সহানুভূতির ভাবও ভারত জগৎকে শিখাইবে।

কলম্বো, কাণ্ডী, জাফনা, অনুরাধাপুর প্রভৃতি স্থান বিবেকানন্দ ক্রমে ক্রমে পরিদর্শন করিলেন। জাফনায় স্বামীজি বেদান্ত সম্বন্ধে এক অতি সুন্দর বক্তৃতা" প্রদান করেন। ইহাতে হিন্দু ধর্ম্মের (অর্থাৎ বৈদিক ধর্ম্ম, যাহা হিন্দু মাত্রই মানিয়া লয়) বেদ, উপনিষদ, স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্রের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়া সৃষ্টিতত্ত্ব, ঈশ্বর, আত্মতত্ত্ব, কর্ম্মফল, সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্ম, অদ্বৈতবাদ, ইষ্ট-নিষ্ঠা প্রভৃতি দুরূহ তত্ত্বের পরিচয় দেন। অদ্বৈতবাদের কথায় বলেন, যাহা চিন্তা করিবে তুমি তাহাই হইবে। যদি আপনাকে দুর্ব্বল ভাব তবে তুমি দুর্ব্বল হইবে, তেজস্বী ভাবিলে তেজস্বী হইবে। যদি তুমি আপনাকে অপবিত্র ভাব, তবে তুমি অপবিত্র হইবে, আপনাকে বিশুদ্ধ ভাবিলে বিশুদ্ধই হইবে। অদ্বৈতবাদ আপনাকে দুর্ব্বল ভাবিতে উপদেশ দেয় না, আপনাকে তেজস্বী সর্ব্বশক্তিমান্ ও সর্ব্বজ্ঞ ভাবিতে উপদেশ দেয়। আর বর্ত্তমান যুগধর্ম্ম অন্যের সাহায্য করা, অন্যকে কিছু দান করা; "দানমেকং কলিযুগে।"

এইরূপে সিংহলে অদ্বৈততত্ত্ব প্রচার করিয়া স্বামীজি ভারত অভিমুখে যাত্রা করিলেন। সিংহলে যে উৎসাহানল জ্বালাইয়া আসিলেন তাহার ফলে সেখানে এখন বিবেকানন্দ-সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। জাহাজে প্রথমে পাম্বান নামে একটি ক্ষুদ্র দ্বীপে ও পরে রামনদে উপস্থিত হইয়া জনসাধারণের ও রামনাদের রাজার অভিনন্দনের উত্তর দেন। ক্রমে পরমকুড়ি, মনমাদুরা, মাদুরা, কুম্ভকোণম্ পার হইয়া এবং সর্ব্বত্র সমাদর লাভ করিয়া মান্দ্রাজে পৌঁছিলেন। মান্দ্রাজের শেষ বক্তৃতাটি ছিল "ভারতের ভবিষ্যৎ"

সম্বন্ধে। ইহাতে তিনি বলেন, সর্ব্বসাধারণে ধর্ম্ম প্রচারই জাতীয় সম্মিলনের প্রশস্ত পন্থা; তাহার জন্য চাই, শাস্ত্রীয় তত্ত্বসমূহের সাধারণে প্রচার, এবং তার সঙ্গে সঙ্গে, সংস্কৃতের সাহায্যে শিক্ষা-দান,—যাহাতে ভাবের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে একটা গৌরবের ভাবও মনের মধ্যে জাগিয়া উঠে। এই সব কার্য্য করিতে গেলে মনের বল চাই, ঈর্ষাপরায়ণ হইলে চলিবে না, প্রাণ ভরিয়া জননী জন্মভূমিকে ভালবাসিতে হইবে, আর গড়িতে হইবে, ভাঙ্গিবার দরকার নাই। সার্ব্বজনীন হিন্দুমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার সহিত শিক্ষক ও প্রচারক গঠন করিবার জন্য বিদ্যালয় রাখিতে হইবে। তার জন্য লোক চাই, অবশ্য চাই কয়েকজন "আশিষ্ঠো বলিষ্ঠো দ্রঢ়িষ্ঠো মেধাবী"—যাঁহারা যৌবনের তেজে ও নবীনতায় কর্ম্মক্ষম, যাঁহারা অনাঘ্রাত পুষ্পের মত বিশুদ্ধ।

মান্দ্রাজ হইতে ষ্টিমারে স্বামীজি কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিলেন। কলিকাতায় দুইটি বক্তৃতা দেওয়া হয়, একটি রাজা রাধাকান্ত দেবের বাটিতে, অন্যটি ষ্টার থিয়েটারে। এই দুইটি বক্তৃতা হইতে তাঁহার স্বদেশ প্রেমিকতার, গুরুভক্তির এবং "বেদান্তই যে ভারতের ভবিষ্যৎ সমস্যা পূরণ করিবে" সে বিষয়ে দৃঢ় ধারণার পরিচয় পাওয়া যায়। নানা দেশ ঘুরিয়া তাঁহার ধারণা জন্মিয়াছিল, সঙ্ঘ না হইলে কোনও বড় কাজ হইতে পারে না। কিন্তু এই সঙ্ঘের একজন প্রধান পরিচালক চাই, কারণ আমাদের দেশের জনসাধারণ এখনও গুণের মর্য্যাদা করিতে শিখে নাই। তিনি কলিকাতায় ফিরিবার কিছু পরেই রামকৃষ্ণ মিশন সমিতি প্রতিষ্ঠা করিলেন, স্বয়ং তাহার সাধারণ সভাপতি আর স্বামী ব্রহ্মানন্দ কলিকাতা

কেন্দ্রের সভাপতি হইলেন। মঠের পরিচালন বিষয়ে এবং ব্রহ্মচারিদের শিক্ষা বিষয়েও তিনি এই সময় হইতে মন দেন।

অনেকদিন হইতেই স্বামীজির শরীর খারাপ হইয়া পড়িতেছিল। কিছুদিন দার্জ্জিলিঙ্গে কাটাইলেন, পরে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুসারে আলমোড়ায় গেলেন। এদিকে রামকৃষ্ণ মিশনের সেবানুষ্ঠান ক্রমে বাড়িয়া চলিল। মুর্শিদাবাদে অখণ্ডানন্দ স্বামী প্রাণপণ উদ্যোগে দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িতের সাহায্য ও শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। মান্দ্রাজে রামকৃষ্ণানন্দ স্বামী ভাব প্রচারে ব্রতী হইলেন। আলমোড়ায় স্বামীজি প্রথম হিন্দীতে বক্তৃতা দেন, তাঁহার মুখে হিন্দী ভাষা অপূর্ব্ব শক্তি ও শ্রী ধারণ করে। এখানে আড়াই মাস কাটাইয়া যখন একটু সুস্থ বোধ করিলেন, তখন স্বামীজি উত্তর ভারতে প্রচার করিবার জন্য যাত্রা করিলেন। অম্বালা, অমৃতসর, রাওলপিণ্ডি, কাশ্মীর, শ্রীনগর, জম্মু, শিয়ালকোট হইয়া শেষে তিনি লাহোরে উপস্থিত হন। লাহোরে বেদান্ত সম্বন্ধে বক্তৃতা, স্বামীজি দেশে ফিরিয়া যে সব বক্তৃতা দেন তাহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান লাভ করিয়াছে। ইহাতে তিনি অদ্বৈতজ্ঞানকে কার্য্যে পরিণত করিতে, জীবনের সঙ্গে মিশাইয়া লইতে বলিয়াছেন। "এখন আর উহাকে রহস্য রাখিলে চলিবে না, লোকের প্রাত্যহিক জীবনে উহা কার্য্যে পরিণত করিতে হইবে।......উঠ, জাগো, জগতের আধ্যাত্মিকতা রক্ষার জন্য বাহু প্রসারিত করিয়া দাও। আর প্রথমে তোমাদের স্বদেশের কল্যাণের জন্য এই তত্ত্ব কার্য্যে পরিণত কর।...প্রথমে অন্নের ব্যবস্থা করিতে হইবে, তারপর ধর্ম্ম।" তাঁহার উদার ভাবকে আশ্রয় করিয়া সনাতন ও আর্য্য

সম্প্রদায়ের বিরোধও সেই সময়ের জন্য শান্ত হইল। পাঞ্জাব হইতে রাজপুতনা হইয়া অবশেষে তিনি ইংরাজী ১৮৯৮ সালের জানুয়ারীর মাঝামাঝি কলিকাতায় ফিরিলেন।

কলিকাতায় ফিরিয়া স্বামীজি পূর্ব্বের ন্যায় আপন ভাব প্রচারে রত হইলেন। বহুলোক তাঁহার সঙ্গে আলাপ করিতে আসিত, কেহ কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া, কেহ বা প্রকৃত জিজ্ঞাসু হইয়া। পাঞ্জাবে বেড়াইতে গিয়াছিলেন, সেখানকার শিখদের কথা, গুরু-গোবিন্দের অদ্ভুত দেশপ্রেম ও তেজের কথা এই সব প্রসঙ্গ শিষ্য-দের নিকট আলোচনা করিতেন। তাঁহার সমাজ সংস্কার, দেশ-সেবা এই সময়ে কার্য্যে পরিণত হয়। শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথি উপ-লক্ষে ফাল্গুনী দ্বিতীয়ায় যে উৎসব হয় তাহাতে সমাগত ভদ্রমণ্ডলীর মধ্যে যজ্ঞোপবীত বিতরণ করেন। এইবার প্লেগের আশঙ্কায় কলিকাতা কাঁপিয়া উঠে, প্লেগ নিবারণ করিবার জন্য সরকার কঠোর উপায় অবলম্বন করিবেন প্রচার করিলেন, ইহাতে সাধা-রণের আতঙ্ক আরও বাড়িয়া যায়। অনেকেই কলিকাতা ছাড়িয়া পলাইতে আরম্ভ করেন। স্বামীজি তখন ছিলেন দার্জ্জিলিঙ্গে; এই সংবাদ পাইয়াই কলিকাতায় চলিয়া আসেন এবং রোগসন্তপ্তের শুশ্রূষার জন্য ও রোগের প্রকোপ প্রশমিত করিবার জন্য যথোচিত উপায় অবলম্বন করিলেন। কিন্তু এজন্য বিশেষ চেষ্টার প্রয়োজন হইল না, প্লেগ আপনিই কমিয়া গেল। তখন শিষ্যা নিবেদিতা ও অন্যান্য ভক্তসঙ্গে আবার আলমোড়া যাত্রা করিলেন। হিমালয়ে কিছুদিন থাকিয়া তাঁহারা সকলে অমরনাথ যাত্রা করিলেন। অমর-নাথ দর্শন করিয়া স্বামীজি এত তন্ময় হইয়া গিয়াছিলেন যে ইহার পর

হইতেই তিনি বাহিরের কথায় বহির্জগৎ সম্বন্ধে কিছু উদাসীন হইয়া পড়েন। অমরনাথ হইতে কিছুদিন পরে তিনি ক্ষীরভবানী দর্শনে গমন করেন। পূর্ব্বে পূর্ব্বে মুসলমানের অত্যাচারের কথা, দেব-মন্দির ধ্বংসের কথা, ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার হৃদয় ক্ষুব্ধ হইতেছিল, ভাবিতেছিলেন তিনি থাকিলে এরূপ অত্যাচার কখনই হইতে দিতেন না, প্রাণ দিয়াও তাহা নিবারণ করিতেন। কিন্তু এমন সময় তাঁর মনে হইল যে, হঠাৎ দৈববাণী হইল, স্বামীজি যেন স্পষ্ট শুনিতে পাইলেন,—"আমার ইচ্ছাতেই যবনেরা মন্দির ধ্বংস করিয়াছে, আমার ইচ্ছা আমি জীর্ণ মন্দিরে অবস্থান করিব। ইচ্ছা করিলে আমি কি এখানে সপ্ততল সোনার মন্দির তুলিতে পারি না? তুই কি করিতে পারিস্? তোকে আমি রক্ষা করিব, না, তুই আমাকে রক্ষা করিবি?" সেই হইতে স্বামীজি আর কিছু সঙ্কল্প করিতেন না, বলিতেন, মায়ের যা ইচ্ছা তাই হবে। উত্তর ভারত হইতে ফিরিয়া এবার বেলুড় মঠের প্রতিষ্ঠা হইল, নিবেদিতা বাগ-বাজারে তাঁহার বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন, 'উদ্বোধন'ও এই সময় হইতেই বাহির হইতে আরম্ভ হয়।

পর বৎসর গ্রীষ্মকালে, স্বাস্থ্যের কিছুমাত্র উন্নতি না হওয়ায়, স্বামীজি, নিবেদিতা ও তুরীয়ানন্দ আবার ইউরোপ যাত্রা করিলেন। এবারের এই সমুদ্রযাত্রার বিবরণ 'পরিব্রাজক' এ সবিশেষ লিপিবদ্ধ আছে। সাগরবক্ষেই প্রায় দেড় মাস কাটে। লণ্ডনে কিছুকাল কাটাইয়া তাঁহারা আমেরিকায় গেলেন এবং পূর্ব্বের ন্যায় প্রবল বেগে আমেরিকায়, বিশেষ কালিফর্ণিয়া প্রদেশে, ভাব প্রচার হইতে লাগিল। প্যারিসে এই সময় ধর্ম্ম-সভার বৈঠক

বসে। ইহার পূর্ব্বে আমেরিকায় চিকাগোতে যে ধর্ম্ম মহাসভা হয় তাহার উদ্দেশ্য ছিল, খৃষ্টান ধর্ম্মের রোমান ক্যাথলিক শাখা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলিয়া প্রতিপন্ন করা। কিন্তু সে উদ্দেশ্য পূর্ণ হয় নাই, বিবেকানন্দের বেদান্তধর্ম্মই সভ্য জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। তাই এবার কর্ত্তৃপক্ষেরা স্থির করিলেন, ধর্ম্মমত বা তত্ত্বের দিক হইতে না দেখিয়া ধর্ম্মের ইতিহাস লইয়া, ভাব ও ভাবের পরিণতি লইয়া, আলোচনা চলিবে। এবারও স্বামীজি সভায় যোগদান করিলেন এবং পাশ্চাত্য বিদ্বন্মণ্ডলীকে অনেক নূতন কথা শুনাইলেন। অবশেষে কিছুকাল ইউরোপে ভ্রমণ করিয়া দেশে ফিরিলেন।

কিন্তু তাঁহার শরীর ক্রমেই ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। দেশে ফিরিয়াও তিনি বেড়াইতে লাগিলেন, মায়াবতী (আলমোড়া), পূর্ব্ববঙ্গ, আসাম বেড়াইয়া আসিলেন, শরীর আর সারিল না। এ দিকে পুণ্য বারাণসী ধামে রামকৃষ্ণ-সেবাশ্রমের প্রতিষ্ঠা হইল, এবং দেশময় তাঁহার ভাব ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। মঠের সন্ন্যাসীদের শিক্ষার ভার স্বামিজী নিজে গ্রহণ করিলেন; যাহাতে ত্যাগ বৈরাগ্যের উৎকর্ষ হয়, সন্ন্যাসীসঙ্ঘ সুগঠিত ও সুপরিচালিত হয় তাহা দেখিতে লাগিলেন।

এইরূপে কিছুদিন চলিল। অবশেষে অতর্কিতভাবে,—কেহ বুঝিল না, জানিল না, অনুমান করিতেও পারিল না,—১৯০২ সালের ৪ঠা জুলাই তাঁহার দেহের অবসান ঘটে। এই সময় তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৩৯ বৎসর, ৫ মাস, ২৪ দিন। মঙ্গলময়ের ইচ্ছা পূর্ণ হইল, তাঁহার কাজ তিনি করিয়া চলিয়া গেলেন।

সন্ধ্যাকালে ধ্যানে বসিয়া তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হয়। বৈকালে যখন দুই মাইল পথ বেড়াইয়া আসিয়াছিলেন, তখন কে ভাবিয়াছিল এরূপ বিনামেঘে বজ্রপাত হইবে?

মাত্র সাতদিন পূর্ব্বে তাঁহার শিষ্যকে বলিয়াছিলেন, "শ্রদ্ধাবান্ হ— বীর্য্যবান্ হ— আত্মজ্ঞান লাভ কর্— আর পরহিতায় জীবন পাত কর্— এই আমার ইচ্ছা ও আশীর্ব্বাদ।"

স্বামিজীর দান

স্বামিজীর জীবনী ত অতি সঙ্ক্ষেপে আলোচনা করা গেল। যে অল্পকাল তিনি বাঁচিয়া ছিলেন, তাহারই মধ্যে একটা মৃত-সঞ্জীবনী শক্তি সঞ্চারিত করিয়া গেছেন, তাহা এই মুমূর্ষু জাতির শিরায় শিরায় ব্যাপিয়া কি এক নূতন প্রাণের আভাষ দিতেছে। সমস্ত ভারতবর্ষ, বিশেষতঃ বঙ্গদেশ, তাঁহার কাছে কি পাইয়াছে তাহা একবার আলোচনা করিয়া দেখা মন্দ নহে। শুধু কর্ম্মের দিক্ দিয়া নয়, ভাবের দিক দিয়া, নূতন চিন্তা-স্রোতের দিক দিয়া, সকল দিক দিয়াই আমরা তাঁহাকে বুঝিতে ও পাইতে চাই; আমরা চাই—তাঁহার দান বুঝিয়া লইতে, সে দানের যাহাতে উপযুক্ত হই, যোগ্য হই, সে পক্ষে যত্ন করিতে।

উনবিংশ ও বিংশ-শতাব্দীর মধ্যে বাঙ্গলার কর্ম্মক্ষেত্রে, আর কিছু হোক্ না হোক্, একটা নূতন জিনিষের সাড়া পাওয়া গিয়াছে। নব্যবঙ্গে যাঁহারা কোনও গুণই দেখিতে পান না, রাজনীতিচর্চ্চা যাঁহাদের মতে সময়ের অপব্যয়, আধুনিক যুগের সভ্যতা যাঁহারা বলেন অধ্যাত্মমার্গের পরিপন্থী, তাঁহারাও এই নবীন সম্প্রদায়ের সেবাপরায়ণতার কথা স্বীকার করিয়াছেন। অর্দ্ধোদয়যোগ হউক, আর অন্য যে কোন যোগস্নানই হউক, অগ্নিদাহ হউক আর অনাবৃষ্টি অতিবৃষ্টি হউক, অনাথই হউক আর ব্যাধিগ্রস্ত হউক, বিপন্নের সাহায্যার্থ স্কুল কলেজের ছেলের দল আজ কোমর বাঁধিয়া দাঁড়াইতে সঙ্কুচিত নহে। সুদূর পল্লীর স্কুলসংক্রান্ত

অনুষ্ঠানের মধ্যেও কাঙ্গালী-ভোজনের উল্লেখ আছে, সকল সৎকর্ম্মের মধ্যেই আজ দরিদ্র নরনারায়ণের সেবার স্থান আছে। এই দরিদ্র-নরনারায়ণ-সেবা, এই দুঃস্থের প্রতি সহানুভূতি, এই বিপন্নের সাহায্যকল্পে চেষ্টা, আমরা পাইয়াছি স্বামিজীর নিকটে। কাঙ্গালী তাঁহার কাছে কাঙ্গালী নয়, সে যে দরিদ্র নরনারায়ণ, ভগবান্ স্বয়ং মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া আমাদের কাছে সেবা চাহিতেছেন, তাহা যে আমাদের জীবনই ধন্য করিবার জন্য। নবযুগের এরূপ সেবার প্রবৃত্তি বাঙ্গালী শিখিয়াছে বিবেকানন্দ-প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশন হইতে। বরাহনগরে প্রথমে যখন মঠ স্থাপিত হয়, তখন স্বামিজীর উপদেশ মত নবদীক্ষিত সন্ন্যাসীরা দরিদ্র ও অভ্যাগত লোকদিগকে খাওয়াইতেন এবং গৃহী ভক্তদের পীড়া ও বিপদের সময় প্রাণপণে সেবা শুশ্রূষা করিতেন। পরে যখন দিগ্বিজয় করিয়া স্বামিজী দেশে ফিরিলেন, তখন তাঁহারই উৎসাহে অখণ্ডানন্দ, ত্রিগুণাতীত, বিরজানন্দ দেশের সর্ব্বত্র সেবাধর্ম্মের অনুষ্ঠান আরম্ভ করিলেন। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে স্বামিজী স্বয়ং প্লেগের জন্য শুশ্রূষার ব্যবস্থা করিতে দার্জ্জিলিং হইতে কলিকাতায় আসিলেন। আর শরীর অসুস্থ সত্ত্বেও যতদিন তাঁহার এদিকে কিছু কাজ করিবার ছিল ততদিন কলিকাতা ছাড়িয়া যান নাই। আর কি করিয়া এই সেবা করিতে হইবে, কি ভাব নিয়া করিতে হইবে, সে বিষয়েও স্বামিজী তাঁহার গুরুদেবের নিকট হইতে উপদেশ পাইয়াছিলেন। একদিন তিনি "নামে রুচি, জীবে দয়া, বৈষ্ণবপূজন" বুঝাইতে গিয়া ভাবস্থ হইয়া পড়িলেন এবং অর্দ্ধবাহ্য অবস্থায় বলিলেন, "জীবে দয়া—তুই দয়া কর্‌বার কে? না, না,

জীবে দয়া নয়—শিবজ্ঞানে জীবের সেবা।" এই কথা সব চাইতে পরিষ্কার করিয়া বুঝিলেন নরেন্দ্রনাথ। তাই দরিদ্র, "নারায়ণ," —সেবা, পরোপকার নয়। এই "জীবে প্রেমে"র কি উচ্ছ্বাসই না প্রকাশ পাইয়াছে স্বামিজীর কাছে,—"যে যে তাঁর সেবার জন্য—তাঁর সেবা নয়—তাঁর ছেলেদের, গরিব গুর্‌বো, পাপী তাপী, কীট পতঙ্গ পর্য্যন্ত তাদের সেবার জন্য যে যে তৈয়ার হবে, তাদের ভিতর তিনি আস্‌বেন। তাদের মুখে সরস্বতী বস্‌বে, তাদের চক্ষে মহামায়া মহাশক্তি বস্‌বেন।" "এমন দিন কি হবে যে, পরোপকারায় জান্ যাবে? দুনিয়া ছেলেখেলা নয়—বড় লোক তাঁরা, যাঁরা আপনার বুকের রক্ত দিয়ে রাস্তা তৈরী করেন—এই হয়ে আস্‌ছে চিরকাল—একজন আপনার শরীর দিয়ে সেতু বানায়, আর হাজার হাজার তার উপর দিয়ে নদী পার হয়। এবমস্তু এবমস্তু শিবোঽহং শিবোঽহং।" "বসে বসে রাজভোগ খাওয়ায়, আর 'হে প্রভু রামকৃষ্ণ' বলায়, কোনও ফল নাই, যদি কিছু গরিবদের উপকার করিতে না পার। * * * গেরুয়া কাপড় ভোগের জন্য নহে—মহাকার্য্যের নিশান—কায়মনোবাক্যে "জগদ্ধিতায়" হইতে হইবে। পড়েছ, "মাতৃদেবো ভব, পিতৃদেবো ভব," আমি বলি "দরিদ্রদেবো ভব, মূর্খদেবো ভব,"—দরিদ্র, মূর্খ অজ্ঞানী কাতর ইহারাই তোমার দেবতা হউক, ইহাদের সেবাই পরমধর্ম্ম জানিবে। আমি মুক্তি চাই না, ভক্তি চাই না, আমি লাখ নরকে যাব,—"বসন্তবল্লোকহিতং চরন্তঃ"—এই আমার ধর্ম্ম। * * * যে ধর্ম্ম বা যে ঈশ্বর বিধবার অশ্রুমোচন অথবা পিতৃমাতৃহীন অনাথের মুখে এক টুকরা রুটী দিতে না পারে,

আমি সে ধর্ম্মে বা সে ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না। * * * আমি ঈশ্বরকে বিশ্বাস করি, আমি মানুষকে বিশ্বাস করি, দুঃখী দরিদ্রকে সাহায্য করা, পরের সেবার জন্য নরকে যাইতে প্রস্তুত হওয়া আমি খুব বড় কাজ বলিয়া বিশ্বাস করি। এই'ত পূজো, নরনারী শরীর-ধারী প্রভুর পূজো, আর যা কিছু, 'নেদং যদীদমুপাসতে।' বিবেকানন্দের এই জ্বলন্ত বাণী, নবযুগের সেবাধর্ম্মের সংহিতা।

স্বদেশ-প্রেমে, স্বদেশের ভাবে, স্বদেশ-হিতৈষণার চেষ্টায় আজ সমস্ত দেশ টল্‌মল্, এ বিষয়েও স্বামিজীর জীবনী আলোচনা করিলে, তাঁহার রচনা পড়িলে, তাঁহার নিকট গেলে আমরা অনেক শিখিতে পারিব। যুক্তরাজ্যে দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শয়ন করিয়াও এক রাত্রি তাঁহার বিনিদ্র অবস্থায় কাটে কেন, জানেন? সে রাত্রি কেবল তিনি কাঁদিয়াছিলেন—দেশে তাঁহার দীন দরিদ্র অর্দ্ধাশনে ক্ষীণতনু দেশবাসীরা কি ভাবে আছে তাহা ভাবিয়া। ভারতের প্রাচীন গৌরবের ও অতুল ঐশ্বর্য্যের কথা বলিতে তাঁহার ক্লান্তি ছিল না। দেশের কথা বলিতে গিয়া তিনি আপনাকে হারাইয়া ফেলিতেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে তিনি বলিয়াছেন, আপনার থ্যাদা, বোঁচা ভাইটিকে যেমন দেখি আর কাহাকেও তেমন সুন্দর দেখি না। "বর্ত্তমান ভারতে" দার্শনিক আলোচনার পর তিনি আর স্থির থাকিতে না পারিয়া আবেগপূরিত কণ্ঠস্বরে বলিয়াছেন,—"হে ভারত! ভুলিও না, তোমার নারীজাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী; ভুলিও না, তোমার উপাস্য উমানাথ সর্ব্ব-ত্যাগী শঙ্কর; ভুলিও না, তোমার বিবাহ, তোমার ধন, তোমার জীবন, ইন্দ্রিয়সুখের—নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে, ভুলিও

না তুমি জন্ম হইতে মায়ের জন্য বলিপ্রদত্ত,—ভুলিও না তোমার সমাজ সে বিরাট মহামায়ের ছায়ামাত্র ; ভুলিও না, নীচজাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর, তোমার রক্ত, তোমার ভাই। হে বীর ! সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল, আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই ; বল, মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই। তুমিও কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত হইয়া সদর্পে ডাকিয়া বল, ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশু শয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্দ্ধক্যের বারাণসী।" দেশে ফিরিয়া যেখানেই তিনি বক্তৃতা করিয়াছেন প্রায় সেইখানেই তিনি স্বদেশের গুণ-কীর্ত্তন না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। প্যারিস মহাপ্রদর্শনীতে গিয়া যখন দেখিলেন নানা দেশ হইতে পণ্ডিতমণ্ডলী সমবেত হইয়াছেন তথন তাঁহার মনে পড়িল :—"আর আমার জন্মভূমি, এ জার্ম্মাণ ফরাসি ইংরাজী ইতালি প্রভৃতি বুধমণ্ডলী-মণ্ডিত মহা-রাজধানীতে তুমি কোথায়, বঙ্গভূমি ? কে তোমার নাম নেয় ? কে তোমার অস্তিত্ব ঘোষণা করে ? সে বহু গৌরবর্ণ প্রতিভামণ্ডলীর মধ্য হইতে এক যুবা যশস্বী বীর বঙ্গভূমির-আমাদের মাতৃভূমির-নাম ঘোষণা করিলেন,. সে বীর জগৎ প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ডাক্তার জে, সি, বোস।" কলম্বোতে বক্তৃতার সময় বলিয়াছেন,—"ভারত পুণ্যভূমি, কর্ম্মভূমি, আমি এই সভার সমক্ষে দৃঢ়তার সহিত বলিতেছি, ইহা সত্য, সত্য, অতি সত্য। বন্ধুগণ, বিশ্বাস করুন, ভারতই জগৎকে আধ্যাত্মিক তরঙ্গে ভাসাইবে।" পম্বনে আরম্ভ

করিলেন, "আমাদের পবিত্র মাতৃভূমি।" কুম্ভকোণমে বলিয়াছেন, "আমাদের জাতি অতীতকালে মহৎ কর্ম্মসকল সম্পাদন করিয়াছে। যদি ভবিষ্যতে আমরা মহত্তর কার্য্য না করিতে পারি তবে একত্রে শান্তিতে ডুবিয়া মরিব—ইহাতেই আমরা শান্তি লাভ করিব যে আমরা একত্র মিলিয়া মরিয়াছি। স্বদেশ হিতৈষী হও, যে জাতি অতীতকালে আমাদের জন্য এত বড় বড় কাজ করিয়াছে, সেই জাতিকে প্রাণের সহিত ভালবাস।" মান্দ্রাজে ভিক্টোরিয়া হলে তাঁহার সমরনীতি সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, দেশভক্তির কথা যাহা বলিয়াছেন তাহা হইতে তাঁহার উচ্চধারণার পরিচয় পাই। "লোকে স্বদেশ-হিতৈষিতার কথা বলিয়া থাকে। আমিও স্বদেশ-হিতৈষিতায় বিশ্বাসী। স্বদেশ-হিতৈষিতার সম্বন্ধে আমারও একটা আদর্শ আছে। মহৎকার্য্য করিতে হইলে তিনটি জিনিষের আবশ্যক হয়। প্রথমতঃ, হৃদয়বত্তা, আন্তরিকতা আবশ্যক। বুদ্ধি 'বিচারশক্তি' আমাদিগকে কতটুকু সাহায্য করিতে পারে, উহারা আমাদিগকে কয়েক পদ অগ্রসর করে মাত্র। কিন্তু হৃদয়দ্বার দিয়াই মহাশক্তির প্রেরণা আসিয়া থাকে। প্রেম অসম্ভবকে সম্ভব করে;—জগতের সকল রহস্যই প্রেমিকের নিকট উন্মুক্ত। হে ভাবী সংস্কারকগণ, হে ভাবী স্বদেশহিতৈষীগণ! তোমরা হৃদয়বান্ হও, প্রেমিক হও। তোমরা কি প্রাণে প্রাণে বুঝিতেছ যে কোটী কোটী দেব ও ঋষির বংশধরগণ পশুপ্রায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে? তোমরা কি প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতেছ যে কোটী কোটী লোক অনাহারে মরিতেছে এবং কোটী কোটী ব্যক্তি শত শত শতাব্দী ধরিয়া অর্দ্ধাশনে কাটাইতেছে? তোমরা কি এই সকল ভাবিয়া অস্থির

হইয়াছ? এই ভাবনায় কি নিদ্রা তোমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছে? এই ভাবনা কি তোমাদের রক্তের সহিত মিশিয়া তোমাদের শিরায় শিরায় প্রবাহিত হইয়াছে—তোমাদের হৃদয়ের প্রতি স্পন্দনের সহিত কি এই ভাবনা মিশিয়া গিয়াছে? এই ভাবনা কি তোমাদিগকে পাগল করিয়া তুলিয়াছে? দেশের দুর্দ্দশার চিন্তা কি তোমাদের একমাত্র ধ্যানের বিষয় হইয়াছে এবং ঐ চিন্তায় বিভোর হইয়া কি তোমরা তোমাদের নামযশ, স্ত্রীপুত্র, বিষয় সম্পত্তি, এমন কি শরীর পর্য্যন্ত ভুলিয়াছ? তোমাদের এরূপ হইয়াছে কি? যদি হইয়া থাকে 'বুঝিও' তোমরা প্রথম সোপানে—স্বদেশ-হিতৈষী হইবার প্রথম সোপানে মাত্র—পদার্পণ করিয়াছ। ....মানিলাম, তোমরা দেশের দুর্দ্দশার কথা প্রাণে প্রাণে বুঝিতেছ—কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, এই দুর্দ্দশা প্রতিকারের কোন উপায় স্থির করিয়াছ কি? কেবল বৃথাবাক্যে শক্তিক্ষয় না করিয়া কোন কার্য্যকর পথ বাহির করিয়াছ কি? লোককে গালি না দিয়া তাহাদের কোন যথার্থ সাহায্য করিতে পার কি? ...কিন্তু ইহাতেও হইল না। তোমরা কি পর্ব্বতপ্রায় বিঘ্ন-বাধাকে তুচ্ছ করিয়া কার্য্য করিতে প্রস্তুত আছ? যদি সমগ্র জগৎ তরবারিহস্তে তোমাদের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হয় তথাপি তোমরা যাহা সত্য ঠাওরাইয়াছ, তাহাই করিয়া যাইতে পার? যদি তোমাদের স্ত্রীপুত্র তোমাদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়, যদি তোমাদের ধনমান সব যায়, তথাপি কি তোমরা উহা ধরিয়া থাকিতে পার?.........তোমাদের কি এইরূপ দৃঢ়তা আছে? যদি এই তিনটি জিনিষ তোমাদের থাকে, তোমরা প্রত্যেকেই

অলৌকিক কার্য্য সাধন করিতে পার।” দেশে ফিরিয়া এক পাঞ্জাবী ভদ্রলোকের সঙ্গে প্রায় দেড় ঘণ্টা ধরিয়া তাঁহার পাঞ্জাবের কৃষকদের অবস্থা সম্বন্ধে আলাপ হইয়াছিল। যাইবার সময় ভদ্র-লোকটি দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন, এতক্ষণ বৃথা গেল, ধর্ম্মচর্চ্চা কিছু হইল না। তাহাতে স্বামীজি বলিলেন, “যতদিন আমার দেশের একটি কুকুর পর্য্যন্ত অভুক্ত থাকিবে ততদিন তাহাকে খাওয়ানই আমার ধর্ম্ম, তা ছাড়া অন্য যা কিছু সব অধর্ম্ম বা মিথ্যা ধর্ম্ম।” বিলাত হতে ফিরিবার সময় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, “স্বামীজি, এতদিন বিদেশে ছিলেন, এখন দেশ আপনার কাছে কেমন লাগিবে?” স্বামীজি উত্তর দেন, “এদেশে আসার আগেও আমি দেশকে ভালবাসিতাম। কিন্তু এখন ভারতের বায়ু, এমন কি সেখানকার প্রতি ধূলিকণা, আমার নিকট পবিত্র। ভারতভূমি পবিত্রভূমি, হিন্দুস্থান আমার তীর্থস্থান।”

বিবেকানন্দ বাঙ্গালায় সন্ন্যাসী-সঙ্ঘ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। সম্প্রদায় নয়, সঙ্ঘ। সম্প্রদায়ের ভেদ বিদ্বেষ যাহাতে না থাকে, তাহার জন্য ইহার স্বতন্ত্র কোন সাম্প্রদায়িক অস্তিত্ব নাই, আছে শুধু এক সন্ন্যাসী-সঙ্ঘ, যাঁহারা প্রয়োজন হইলে নিরন্নকে অন্নদান করিতে, উলঙ্গের লজ্জা নিবারণ করিতে, অনাথের আশ্রয় হইতে সঙ্কুচিত নহেন। স্বামীজি এদিক্ হইতে সমগ্র দেশের কৃতজ্ঞতা-ভাজন, সে কথা অস্বীকার করিবার জো নাই। এ সন্ন্যাসী নূতন ধরণের সন্ন্যাসী, যাঁহারা ধ্যান ধারণা অপেক্ষা কর্ম্মকে বড় করিয়া দেখেন, তাঁহাদেরও ইঁহার বিরুদ্ধে বলিবার কিছু নাই। আধ্যাত্মিক উন্নতির সহিত প্রাণভরা আবেগ লইয়া, বুকভরা ভালবাসা লইয়া,

মানবকে সাহায্য করিতে অগ্রসর এরূপ একদল ত্যাগীর অভাব ভারত বোধ করিয়াছিল, যাঁদের কথা কবি বলিয়াছিলেন,—

আর্ত্তবুকে চায় আজ সন্ন্যাসী ভারত,
প্রাণবলে ভরপুর কয়টি পাগল,
যাদের আপনাভোলা হৃদয় বন্যার
হীনতার শিলারাশি যাবে রসাতল।

বিবেকানন্দ এ অভাবও মিটাইয়া দিয়াছেন, দক্ষিণ ভারতের ভারতসেবক সমিতি আছে, অন্য প্রদেশের অন্য কত অনুষ্ঠান আছে, আমাদের বাঙ্গালদেশে আছে—রামকৃষ্ণ মিশন।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দেখিতে পাই, একটা মস্ত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। নরমপন্থী, চরমপন্থী, সকলেই আজ নীতিপন্থী। কর্ম্ম-নিষ্ঠ গোখলে হইতে মহাত্মা গান্ধী, মহাত্মা গান্ধী হইতে পঞ্জাব-কেশরী লাজপত রায়, সকলেই আত্মবলের উপর, নৈতিক শক্তির উপর জোর দিতেছেন। রাজনীতির এই সুর স্বামীজির কণ্ঠেও বাজিয়াছে। তথাকথিত রাজনীতির নামে অবশ্য তিনি চটা ছিলেন, একপত্রে লিখিয়াছেন, "কল্‌কাতা থেকে আমার বক্তৃতা ও কথাবার্ত্তা সম্বন্ধে যে সব বই ছাপা হয়েছে তাতে একটা জিনিষ আমি দেখতে পাচ্চি। তাদের মধ্যে কতকগুলি এরূপভাবে প্রকাশ করা হয়েছে যে পড়্‌লে বোধ হয় যেন আমি রাজনীতি নিয়ে আলোচনা কচ্ছি। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু আমি রাজনীতিতে বা রাজনৈতিক আন্দোলনকারী নই। আমার লক্ষ্য কেবল আত্মতত্ত্বের দিকে—সেইটে যদি ঠিক হয়ে যায়, তবে আর সমস্ত ঠিক হয়ে যাবে—এই আমার মত। অতএব তুমি কল্‌কাতার

লোকদের অবশ্য সাবধান করে দেবে, যেন আমার কোন লেখা বা কথার ভিতর রাজনৈতিক উদ্দেশ্য মিথ্যা করে আরোপ করা না হয়। কি আহাম্মকি!" আর এক পত্রে লিখিতেছেন,—"কাপুরুষতা কি রাজনৈতিক বাঁদরামোর সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ নাই, আমি রাজনীতি মোটেই বিশ্বাস করি না। আমার রাজনীতি ভগবান্ ও সত্য। আর সব ছাই ভস্ম।" কিন্তু আজকাল ভারতের রাজনীতিও ভগবান্ ও সত্যে প্রতিষ্ঠিত হইতে চলিয়াছে। শক্তি বা তেজকে কোন গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রাখা যায় না। তাহা বিশ্বগ্রাসী—এক বিষয়ে আসিলে অন্য বিষয়েও সঞ্চারিত হইবে। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে স্বদেশী আন্দোলনের ৫।৬ বৎসর পূর্ব্বে কালিফোর্ণিয়ায় বক্তৃতা দিতে গিয়া তিনি বলেন:—Let us perfect the means, the end will take care of itself. For the world can be good and pure only if our lives are goodand pure. (উপায়টি ঠিক হইলেই, কাজটিও ঠিক হইবে। পৃথিবী সৎ এবং পবিত্র হইতে পারে, যদি আমরা আমাদের জীবনকে সৎ ও পবিত্র করি)। তাঁহার এই কথা আজ দেশের রাজনীতির মূলনীতি হইয়া দাঁড়াইতেছে,—আজ ভারতের নব যুগের পুরোহিত মহাত্মা গান্ধীও বলিতেছেন "চালাকি দ্বারা কোন মহৎ কার্য্য সম্পন্ন হয় না।" স্বামিজী হইতেই এ ভাব আসিয়াছে তাহা বলিতে চাই না, তবে তাঁহার মতে ও বর্ত্তমান রাজনৈতিক প্রবৃত্তির মধ্যে যে বেশ একটা সাদৃশ্য দেখিতেছি তাহাই নির্দ্দেশ করিতে চাই।

সাহিত্যে,—বঙ্গ সাহিত্যে তাঁহার স্থানের কথা কিছু বলা

আবশুক। বাঙ্গালীর ভাষার ক্রিয়াপদের সংখ্যা কিছু কমাইয়া এবং তাহার স্থানে বিশেষণ প্রয়োগ করিয়া, ভাষাকে তিনি সতেজ করিয়া তুলিয়াছেন। তাঁহার ভাষাও ভাবেরই অনুগত ছিল। "পরিব্রাজক' গ্রন্থে পাশ্চাত্যে গঙ্গাজল পানের কথা বলিতে গিয়া লিখিয়াছেন,—"পান কল্লেই কিন্তু সে পাশ্চাত্য জনস্রোতের মধ্যে, সভ্যতার কল্লোলের মধ্যে, সে কোটি কোটি মানবের উন্মত্তপ্রায় দ্রুত পদসঞ্চারের মধ্যে, মন যেন স্থির হয়ে যেত। সে জনস্রোত, সে রজোগুণের আস্ফালন, সে পদে পদে প্রতিদ্বন্দ্বি সংঘর্ষ, সে বিলাসক্ষেত্র, অমরাবতীসম প্যারিস, লণ্ডন, নিউইয়র্ক, বার্লিন, রোম সব লোপ হয়ে যেত, আর শুনতাম—সেই "হর্ হর্ হর্", দেখ্‌তাম—সেই হিমালয়-ক্রোড়স্থ বিজন বিপিন, আর কল্লোলিনী সুরতরঙ্গিণী যেন হৃদয়ে মস্তকে শিরায় শিরায় সঞ্চার কর্‌ছেন, আর গর্জ্জে গর্জ্জে ডাক্‌ছেন—"হর্ হর্ হর্"!!" এই অংশ টুকু পড়িলেই পাঠকের মনও স্থির হইয়া যায়। তাঁহার বক্তৃতা বা লেখা পড়িলে প্রাণে তেজের সঞ্চার হয়, তাঁহার রচনারীতি কান্ত-কোমল নহে, বজ্র নির্ঘোষ, তেজস্বী মহাপুরুষের গম্ভীর রব। ধীর শব্দবিন্যাস, ভাব ও ভাষার সামঞ্জস্য, অল্প কথায় অধিক ভাব প্রকাশের শক্তি, সরসতা, লালিত্য ও গাম্ভীর্য্যের একত্র সন্নিবেশ তাঁহার ভাষাকে অতি মধুর করিয়া তুলিয়াছে। এমন সরল ও সরস অথচ পুরুষোচিত লেখা বই আমাদের খুব বেশী নাই। যৌবন ও কৈশোরের সন্ধিস্থলে, লোকের চিত্তবৃত্তি যখন স্ফুটনোন্মুখ, তখন মানুষের হাতে দেওয়ার জন্য স্বামীজির রচনার মত এমন সুন্দর ও উপযোগী রচনা আমাদের ভাষায় আর কি ই বা আছে? তাঁহার

লেখার মধ্যে পুরুষোচিত তেজ ছিল, তাহা যে কোন রচনা দেখিলেই স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। ধর্ম্ম ও দর্শন তিনি সহজবোধ্য ও চিত্তাকর্ষক করিয়া দিয়া গিয়াছেন, সে পক্ষে তাঁহার সকল পুস্তকই সাক্ষ্য দিবে। ধর্ম্মশাস্ত্রের,—ভক্তিযোগ, কর্ম্মযোগ, জ্ঞান-যোগ, রাজযোগের ব্যাখ্যা, দুরূহ অদ্বৈততত্ত্বের সরলমর্ম্ম তিনি যেমন দিয়া গিয়াছেন তেমন আমরা আর কোথায় পাইয়াছি?

আর দিয়া গিয়াছেন তিনি আমাদিগকে, তাঁহার মানসকন্যা নিবেদিতা। নিবেদিতা মানসকন্যা, তাঁহারই ভাবে অনুপ্রাণিতা, তাঁহারই মন্ত্রের সাধনা করিয়া গিয়াছেন। এই গুণবতী ঋষিকল্পা মহিলাকে তিনি ভারতের সম্মুখে নিবেদন করিয়াছিলেন, তাই "নিবেদিতা" নাম। নিবেদিতাকে তিনি যে আশীর্ব্বাদ করিয়া গিয়াছেন, তাহা আজ সার্থক হইয়াছে। ভারতের ভবিষ্যৎ সন্তানের গুরু, সেবিকা, বন্ধু,--নিবেদিতা একা সকলই। বাস্তবিক, এই যুগে জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্মের সামঞ্জস্য করিবার জন্যই যেন নিবেদিতাকে ভগবান্ ভারতবর্ষে পাঠাইয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ দেখাইয়া গিয়াছেন জ্ঞানের দিক, বিবেকানন্দ দেখাইয়াছেন কর্ম্মের দিক, নিবেদিতা দেখাইয়া গিয়াছেন ভক্তির দিক। একটি সামান্য প্রতিষ্ঠান লইয়া ভগিনী নিবেদিতা তাঁহার জীবন কাটাইয়া দিলেন! ভারতের প্রতি তাঁহার কি অসীম শ্রদ্ধা ছিল, ভারতের প্রতি নর-নারীর মধ্যে তিনি কি পবিত্রতা দেখিতে পাইতেন! ইংরাজী line কথার বাঙ্গালা প্রতিশব্দ যখন খুঁজিয়া পাইলেন, তখন তাহার আনন্দের অবধি দেখে কে! দুঃখের বিষয়, তাঁহার জীবনকালে আমরা তাঁহার আদর করি নাই। যাক্ সে কথা—বলিতেছিলাম, এই নিবেদিতাও স্বামীজির দান।

স্বামীজি কিছু ভাঙ্গিতে চাহেন নাই, গড়িতে চাহিয়াছিলেন। আধুনিক সংস্কারকগণের সহিত এইখানেই তাঁহার পার্থক্য। আমরা প্রাচীনের অনুসরণ করিতে গিয়া একেবারে গতানুগতিক হই, যুগধর্ম্মকে না মানি, ইহা তিনি পছন্দ করিতেন না, আবার পুরাতনকে গালি দিয়া, পুরাতনকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নূতন গড়ি, ইহাও তাঁহার ইচ্ছা ছিল না। এ বিষয়ে তিনি যাহা বলিয়া গিয়াছেন তাহা সকলেরই ভাবিয়া দেখা উচিত—"তুই যদি পুরাণ চালটা খারাপ বুঝে থাকিস্ ত যেমন বল্লুম নূতন ভাবে চলতে শেখ্ না। তোর দেখাদেখি আর দশজনে তাই কর্‌বে; তাদের দেখে আবার আর ৫০ জনে শিখ্‌বে, এইরূপে কালে সমস্ত জাতটার ভিতর ঐ নূতন ভাব জেগে উঠ্‌বে। আর বুঝেও যদি তুই সেরূপ কাজ না করিস্ তবে জান্‌ব তোরা কেবল কথার পণ্ডিত—practically (বস্তুতঃ) মূর্খ"

দেশের চিন্তাস্রোত আলোচনা করিতে গেলে, আর একটি কথা আমাদের মনে পড়ে, সেটি হইতেছে—কর্ম্ম। "আজ্‌কে যে তোর কাজ করা চাই, স্বপ্ন দেখার সময় যে নাই"—"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত"—শতকণ্ঠে আজ ধ্বনিত হইতেছে। স্বামীজি অবশ্য জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম্ম—সকলের উপরই জোর দিতেন, কিন্তু কর্ম্মযোগই যেন ভারতের প্রতি তাঁহার শ্রেষ্ঠ দান। আত্মা অনন্ত শক্তির আধার, সব কাজ করিতে পারে মানুষ, চাই শুধু আগ্রহ ও চেষ্টা। "ব'লে কি হবে? বকাবকি বলা কওয়াতে আমাদের (বিশেষ বাঙ্গালীর মত) কে বা মজবুত? যদি পার ত কোরে দেখাও। কাজ কথা কহুক, মুখকে বিশ্রাম দাও।"

"মহাতেজ, মহাবীর্য্য, মহা উৎসাহ চাই, মেয়েনেকড়ার কি কাজ?" "দুনিয়ায় আগুন লাগিয়ে দিতে হবে।" "Onward and forward—আমার পুরাণ বুলি। * * * তোরা কোমর বেঁধে লেগে যা দেখি, হুহুঙ্কারে দুনিয়ায় তোলপাড় করে দেব। এই ত সবে সন্ধ্যা রে ভাই।" "নিজেরা কিছু করে না এবং অপরে কিছু করিতে গেলে ঠাট্টা করে উড়িয়ে দেয়, এই দোষেই আমাদের জাতের সর্ব্বনাশ হইয়াছে। হৃদয়হীনতা, উদ্যমহীনতা সকল দুঃখের কারণ। অতএব ঐ দুইটি পরিত্যাগ করিবে। কার মধ্যে কি আছে কে জানে, প্রভু বিনা? সকলকে সুযোগ দাও। পরে প্রভুর ইচ্ছা।" "উঠে পড়ে লেগে যাও দেখি। গল্পমারা ঘণ্টা নাড়ার কাল গেছে হে বাপু, কার্য্য করিতে হইবেক। * * * যারা আপনার আয়েস চায়, কুড়েমি চায়, যারা আপনার জিদের সামনে সকলের মাথা বলি দিতে রাজি, তারা আমাদের কেউ নয়, তারা তফাৎ হয়ে যাক্ এই বেলা ভালয় ভালয়।" * * * "কার্য্য কার্য্য—জীবন জীবন—মতে ফতে এসে যায় কি? ফিলসফি, যোগ, তপ, ঠাকুরঘর, আলোচাল, কলামূলা—এসব ব্যক্তিগত ধর্ম্ম, দেশগত ধর্ম্ম—পরোপকারই এক সার্ব্বজনীন মহাব্রত। আবালবৃদ্ধবনিতা আচণ্ডাল আপশু সকলেই এ ধর্ম্ম বুঝিতে পারে।" "শুধু negative ধর্ম্মে কি ফল হয়? পাথরে ব্যভিচার করে না, গরুতে মিথ্যা কথা কয় না, বৃক্ষেরা চুরি ডাকাতি করে না, তাতে আসে যায় কি? তুমি চুরি কর না, মিথ্যা কথা কওনা, ব্যভিচার কর না, ৪ ঘণ্টা ধ্যান কর, আট ঘণ্টা ঘণ্টা বাজাও"—* * "শরীর ত যাবেই, কুড়োমিতে কেন যায়?"

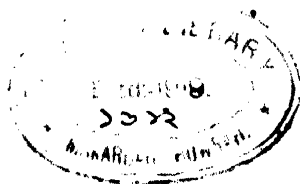
It is better to wear out than to rust out. (মরিচা ধরিয়া নষ্ট হওয়ার চেয়ে ক্ষয় হওয়া ভাল)। কর্ম্ম, কর্ম্ম, কর্ম্ম, হম্ আওর্ কুছ্ নেহি মাঙ্গ্তে হেঁ—কর্ম্ম, কর্ম্ম,—even unto death (মৃত্যু পর্য্যন্তও)। দুর্ব্বলগুলোর কর্ম্মবীর মহাবীর হতে হবে—টাকার জন্য ভয় নাই, টাকা উড়ে আস্‌বে। টাকা যাদের হইবে তারা নিজের নামে দিক্, হানি কি! কার নাম—কিসের নাম? কে নাম চায়? দূর কর নামে। ক্ষুধিতের পেটে অন্ন পৌঁছাতে যদি নাম ধাম সব রসাতলেও যায়, অহো ভাগ্যমহো ভাগ্যম্।"

স্বামীজি আরও একটা জিনিষ দিয়া গিয়াছেন,—নব্য ভারতকে আত্মপ্রত্যয় দিয়াছেন, বলিয়াছেন, "বল অস্তি অস্তি, নাস্তি নাস্তি করে দেশটা গেল। সোঽহং সোঽহং শিবোঽহং। কি উৎপাত! প্রত্যেক আত্মাতে অনন্ত শক্তি আছে; ওরে, নেই নেই বলে কি কুকুর বিড়াল হয়ে যাবি নাকি? কিসের নেই? কার নেই? শিবোঽহং শিবোঽহং। নেই নেই শুনলে আমার মাথায় যেন বজ্র মারে। ঐ যে দীনহীন ভাব, ও হল ব্যারাম—ও কি দীনতা? ও গুপ্ত অহঙ্কার। যে যা বলে বলুক, আপনার গোঁয়ে চলে যাও—দুনিয়া তোমার পায়ের তলায় আসবে, ভাবনা নাই; বলে—একে বিশ্বাস কর, ওকে বিশ্বাস কর—বলি, প্রথমে আপনাকে বিশ্বাস কর দিকি। * * * নেই নেই বল্‌লে সাপের বিষ নেই হয়ে যায়। .... তোমরা সকলে ভাব আমরা অনন্ত বলশালী আত্মা—দেখ দিকি কি বল বেরোয়? কিসের দীনহীন! আমি ব্রহ্মময়ীর বেটা। কিসের রোগ, কিসের ভয় কিসের অভাব? দীনহীন ভাবকে কুলোর বাতাস দিয়ে বিদায় কর দিকি।.......

সমস্তই প্রত্যেকের আত্মাতে বর্ত্তমান, যে বলে আমি মুক্ত সেই মুক্ত হবে। যে বলে আমি বদ্ধ সে বদ্ধ হবে। দীনহীন ভাব আমার মতে পাপ এবং অজ্ঞতা। নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ। অস্তি ব্রহ্ম বদসি চেদস্তি ভবিষ্যতি। নাস্তি ব্রহ্ম বদসি চেৎ নাস্তোব ভবিষ্যতি। যে সদা আপনাকে দুর্ব্বল ভাবে, সে কোনকালে বলবান্ হইবে না। যে আপনাকে সিংহ জানে, সে নির্গচ্ছতি জগজ্জালাৎ পিঞ্জরাদিব কেশরী। নেই নেই বল্‌লে সাপের বিষ ক্ষয় হয়ে যায় কিনা! ও কোন দিশি বিনয় হে বাপু—ও রকম দীন হীন ভাবকে দূর করে দিতে হবে। আমি জানিনি ত কোন্ শালা জানে? তুমি জাননা ত এতকাল কল্লে কি? ওসব নাস্তিকের কথা, লক্ষ্মীছাড়ার বিনয়। আমরা সব কর্ত্তে পারি, সব করা যার ভাগ্যে আছে সে আমাদের সঙ্গে হুহুঙ্কারে চলে আসবে, আর লক্ষ্মীছাড়াগুলো বেড়ালের মত কোণে বসে মেউ মেউ কর্‌বে। ...... তুই ভগবান্ আমি ভগবান্, মানুষ ভগবান্ দুনিয়াতে সব কচ্চে, আবার ভগবান্ কি গাছের উপর বসে আছেন? অতএব কাজে লেগে যা।"

বর্ত্তমান সমাজে এই সব ভাব, স্বামীজির এই সব দান, ধীরে ধীরে প্রবেশ লাভ করিতেছে। আমরা এখন ইহাদের প্রকৃত মূল্য বুঝিয়া জীবনের প্রতি কর্ম্মে ইহাদিগকে অভ্যাস করিতে পারি, তবেই আমাদের জীবন ধন্য, আমাদের জন্ম সার্থক হইবে। স্বামীজির মহাপ্রাণ, তাঁহার স্বদেশহিতৈষিতা, তাঁহার অতীতে অসীম শ্রদ্ধা, বর্ত্তমানের প্রতি সদা জাগ্রত কর্ম্মযোগ, ভবিষ্যতের প্রতি স্থির বিশ্বাস, মানুষের প্রতি অগাধ ভালবাসা, দরিদ্র নারায়ণের জন্য অক্লান্ত সেবাপরায়ণতা—যে দেবজীবনের আদর্শ আমাদের

সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছে, আমরা যেন তাহার যোগ্য হইতে পারি, তাহার যোগ্য হইয়া আমরা যেন ক্রমেই উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারি, মঙ্গলময় তাহার বিধান করুন। ওই যে যুগপ্রবর্ত্তকের, মহাপুরুষের গম্ভীর বাণী শুনা যাইতেছে—"মানুষ হয়ে যারা মানুষের জন্য না কাঁদে তারা আবার মানুষ ?"





বিবেকানন্দ চরিত

অধ্যাপক শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন কাব্যতীর্থ এম, এ প্রণীত। মূল্য ।/০ আনা।

বইখানি ছোট; ৬৩ পৃষ্ঠা মাত্র। কিন্তু ইহার মধ্যে গ্রন্থকার স্বামী বিবেকানন্দের কর্ম্ম-বহুল জীবনের অবশ্য-জ্ঞাতব্য সব ঘটনাগুলিই সুকৌশলে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। ভাষা এমন সরল আর লিখন-ভঙ্গী এত মধুর যে বইখানি পড়িতে কোথাও একটু মাত্র ক্লান্তি বোধ হয় না। আমাদের জাতীয় জীবনে স্বামীজির কোন্ টুকু বিশেষ দান তাহা শেষ অধ্যায়ে অতি নিপুণভাবে আলোচিত হইয়াছে। আমরা সকলকেই এই পুস্তকখানি পড়িতে অনুরোধ করি। বাংলার জাতীয় বিদ্যালয়গুলিতে এখানি পাঠ্য-পুস্তকরূপে নির্ব্বাচিত হওয়া উচিত।

—আত্মশক্তি